বিলেতে ভূতের বাড়ি

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ ॥ ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৬২

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৮

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

॥ বিষয় সূচী ॥

দ্য টাওয়ার অফ লণ্ডন

ভূতের বাড়ী। কথাটা কানে এলেই আমাদের মনে একধরনের রোমাঞ্চ মিশ্রিত কৌতূহল জাগে। বর্ষার অন্ধকার রাতে, কিম্বা গা ছম্ ছম্ শীতের সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে জমিয়ে ভূতের গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে? আমার তো মনে হয় খুব কম লোকই আছেন যিনি ভূতের গল্প ব'লতে বা শুনতে ভালবাসেন না। অশরীরিদের কথা মানেই, সত্য আর মিথ্যা হাত ধরাধরি করে বক্তার মুখে আর শ্রোতার কানে আশ্রয় নেয়। অনেক যুক্তিবাদী মানুষ ভূতের কথা উঠলে যুক্তি খাড়া করেন অবিশ্বাসের, কিন্তু গল্পটি শোনেন রসিয়ে রসিয়ে।

যেকোন ভূতের গল্পের উৎস অনুসন্ধান ক'রতে গেলেই পাওয়া যায় এক অসুখী, অতৃপ্ত আত্মার কাহিনী। যার বা যাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করেনি।

সাধারণ মানুষের মনে যখন অতৃপ্তি রয়েছে তখন রাজা, মহারাজাদের মনে অতৃপ্ত বাসনা থাকবে না কেন? আমাদের সাধারণের থেকে রাজা রাজড়াদের চাওয়া পাওয়া, ভোগ বিলাস অনেক বেশী। তাই তাদের অতৃপ্তি অসীম হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্যে স্বদেশে কিম্বা বিদেশে, প্রাসাদে, দুর্গে, স্মৃতি সৌধে খোঁজ পাওয়া যায় অতৃপ্ত আত্মাদের।

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস গড়া আলো আঁধারের এই যে রহস্যময় জগৎ এর বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই, যুক্তিগ্রাহ্য কোন প্রমাণ নেই। তবু আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও আত্মা বা ভূত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ বিশ্বাস শুধু তাদের দেশে নয় বিদেশেও রয়েছে। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কোন প্রাসাদে ঢুকে যদি শোনেন এর কোন কক্ষে বা অলিন্দে কিম্বা গবাক্ষে আত্মার আনাগোনা চলে, অথবা গভীর নিঝুম রাতে শোনা যায় করুণ কান্না, হয়তো বা অনুভূত হয় কারুর নিঃশ্বাস—তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় প্রাসাদগুলির সম্বন্ধে একটু-আধটু পড়েছিলাম, কিছু কিছু গল্পও শুনেছিলাম। ঐ সব দুর্গের ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে শুনেছি ভূতের আনাগোনার কথা, কাজেই ঐ সব দুর্গ দেখার ইচ্ছা ছিল অদম্য।

সুযোগ এলো। ভাবলাম বিদেশে বৈদেহীদের আনাগোনার জায়গাগুলি দেখবো। সব দেখা তো সম্ভব নয়। কয়েকটা দেখেছি মাত্র। সেই সব প্রাসাদে গিয়ে কিছু অনুভব করার সুযোগ কমই হয়েছে। তবে স্থানীয় লোকের কাছে শুনেছি অনেক কাহিনী, জেনেছি ইতিহাস, সেই কথাই ব'লব।

লণ্ডনের প্রাসাদ দুর্গ দ্য টাওয়ার অব লণ্ডন। দেখার জন্য বেরলাম। টেমস নদীর উপর টাওয়ার ব্রীজের কাছে নামলাম। দুর্গে ঢোকার আগে একবার ভাবলাম ঘুরে দেখি বাইরে থেকে। কিছুটা ঘুরতেই হাঁফ ধরে গেল। টেমস নদীর ধারে টাওয়ার অব লণ্ডনের একটা ফটক চোখে পড়ল। এগিয়ে কাছ বরাবর গেলাম। মন দিয়ে দেখছিলাম এর গঠন নৈপুণ্য।

আর ইউ টায়ার্ড? কানের কাছে কে যেন বলল। প্রকাশ্য দিবালোকেও আমার শরীরে রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল। মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত নেমে গেল। অবশ্য মুহূর্তের জন্যে। দিনের বেলা ভয়ের কি আছে! বক্তাকে দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি আমার ঠিক পিছনে প্রায় ছ' ফিট লম্বা বিদেশী একজন দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো ছোট ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল আর বাঙ্‌ময়। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো হাসছে। আর ইউ স্কেয়ার্ড? ভ্রূ নাচিয়ে তেমনি ফিস্‌ফিসে স্বরে বলল সে।

একটু লজ্জিত হ'লাম। আমার মুখে কি তবে ভয়ের ভাব ফুটে উঠেছে? চিন্তাটাকে বেশী আমল না দিয়ে সহজ ভাব করে উত্তর দিলাম, ভয়! ভয় কেন? তাও আবার এই দিন দুপুরে!

লম্বা লোকটি মৃদু হেসে ব'লল—তুমি বিদেশী তো তাই জান না কেন বললাম ভয়। এই যে টাওয়ারগুলো দেখছ, এর ঘর, বাড়ী, ফটক, রেলিং, প্রাচীর সব জীবন্ত। এই প্রাসাদের প্রত্যেকটি পাথরের ভাঁজে ভাঁজে লেগে আছে রক্তের দাগ।

আমি লঘু স্বরে বললাম—তোমার কথা ঠিকই কিন্তু সে তো অতীত। তাকে আবার ভয় কি!

আছে। গম্ভীর ভাবে উত্তর করল সেই লোকটি। দিনের আলোয় ভয় হয় না, তার অর্থ এই নয় যে ভয় নেই। আকাশে যেমন রাত-দিন তারা থাকে, কিন্তু দিনের আলোয় তারা দেখতে পাই না। তেমনি দিনের আলোয় ভয় অনুভব করি না।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম—তুমি কি নিজে কোনদিন দিনের বেলা ভয় অনুভব করেছ?

করেছি বেশ জোর দিয়ে ব'লল। করেছি বলব কেন? অনুভব করি। আমি যে রাতের বেলা তাদের দেখেছি, তাই দিনেও তাদের উপস্থিতি অনুভব করি। এই তো এইমাত্র দেখলাম ট্রেটার গেট দিয়ে রানী এ্যামবোলিনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই লোকটি যেন মনেব কথা বুঝতে পারল, ব'লল, এই যে এই গেটটা দেখছ এটাব নাম ট্রেটার গেট। তুমি যখন দাঁড়িয়ে ছিলে তখনই তো এ্যানবোলিনকে নিয়ে যাওয়া হলো।

আমাব মনে একটু একটু কবে ভয় জন্মাতে লাগল, বিদেশে এসে কি শেষে পাগলের পাল্লায় প'ড়লাম!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি বলল—তুমি আমায় পাগল ভাবছ নাকি? আমি পাগল নয়, আমাব দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো।

সত্যি আাম এতক্ষণ তাকে ভাল ক'রে দেখিইনি, এবার দেখলাম। লম্বা, সুপুরুষ, কালো চোখ, কালো চুল, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যা হ'ক একটা হবে। চেহারার তুলনায় পোষাকটা মলিন।

আমাকে তাকাতে দেখে সে বলল—কি পাগল মনে হয়?

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব'লল—পাগল আমি নই কিন্তু একটা পাগলামী আমাকে পেয়ে বসেছে।

হঠাৎ কৌতুহলি হয়েঁ প্রশ্ন ক'রে ফেলি—সেটা কি?

—এখানকার বিদেহী আত্মাদের কাছ থেকে জানব তাঁরা কে কতটা অন্যায় করেছিলেন, আর তার জন্যে কি শাস্তিই বা পেয়েছেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—এমন শখ কেন?

সে এক ইতিহাস। একবার কয়েক রাত এখানে ছিলাম, একটা টাওয়ারের মধ্যে। তখন কত অলৌকিক ঘটনা দেখেছি কি বলব। সেই থেকে....।

কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বললাম—রাতে টাওয়ারে থাকবেন কি করে? সন্ধ্যা ছটার পর তো আর ঢুকতে দেয় না।

ঠিক কথা। কিন্তু আমি ছিলাম অন্যভাবে। এখানকার এক অফিসার

আমার বন্ধু, তার কাছে ছিলাম। সে আমাকে অনেকবার নিষেধ করেছিল বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জায়গায় যেতে। কিন্তু আমি শুনিনি, গেছি।

আগেই বলেছি ভূতের গল্পের একটা আকর্ষণ আছে, তারই টানে অপরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়েই প্রশ্নকরি, কি দেখেছেন ?

শুনবে ? তার চোখটা যেন আনন্দে নেচে ওঠে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়, বলুন।

এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কি বলা যায়। চল, আগে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ কর, তারপর কাহিনী।

চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক্, কিন্তু এর প্রবেশ দ্বার কোথায় ?

আমার সঙ্গে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে ভাবলাম, এ নিশ্চয় গাইড ; ভূতের গল্পের নাম করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আবার মনে হলো, গাইড হলেই বা ক্ষতি কি ! লোকটা জানে অনেক কিছু। তবে দরদামটা করে নিলে হয়। বিদেশী টাকা তো হাতে বেশী থাকে না।

গাইড ভাবছ নাকি ? নীরবতা ভঙ্গ হলো বলে কিম্বা মনের কথা জেনে ফেলেছে ভেবে আমি চমকে উঠলাম। অবশ্য মুহূর্তের জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না, তা ভাবব কেন ? তবে গাইড হ'লেই বা দোষের কি আছে !

গাইড দোষের হবে কেন ? কিন্তু গাইড হতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়, আমার তো তেমন বিদ্যা নেই। আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি বা যা অনুভব করেছি তাই লোককে বলি।

আমি উৎসাহ দেবার মত করে বললাম, সেটাই তো বড় জিনিষ। নেহাৎ শুকনো পাতার রুক্ষ তথ্য কি সব সময় আমাদের মন ভরাতে পারে।

আমরা টিকিট ঘরের কাছে এলাম। টিকিট কেনবার জন্যে এগোতেই লোকটি বলল, আমার জন্যে যেন টিকিট কেটো না। আমার 'পাস' আছে।

টিকিট কেটে ঢুকলাম দুজনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। পাথর তৈরী দেওয়ালগুলো দেখিয়ে লোকটি বলল, এই যে দেওয়াল দেখছ না এসব অনেক প্রাচীন। নরম্যান সম্রাট উইলিয়াম দ্য কনকারার এটা করিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা ট্রেটার গেটের কাছে এসে পড়লাম। বাইরে থেকে এই গেটটা দেখছিলাম, এবার দেখলাম ভেতর থেকে। উঁচু গম্বুজওয়ালা

একটা বাড়ি দেখিয়ে লোকটি বলল—এই বাড়ির নাম ওয়েকফিল্ড টাওয়ার। এরই কাছে আমি ছিলাম।

ভুলেই গিয়েছিলাম ভূতের গল্পের কথা। টাওয়ারটা দেখাতেই মনে পড়ে গেল বললাম, আপনি যে গল্প ব'লবেন বলেছিলেন।

হ্যাঁ ব'লব, তবে তা গল্প নয়, ঘটনা, সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

বলুন।

বলছি, চল একটু এগিয়ে গেলে দেওয়ালের ধার ঘেঁসা দুটো পাথর আছে। একটা সাদা আর একটা লাল। দেওয়ালের গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। এভারগ্রীণ গাছের নীচে ঘাসে ঢাকা পাথর দুটো কারুর নজরে পড়ে না। আমার পড়েছিল, আর একজনেরও পড়েছিল।

সে কে ?

বলব, বলব, কোন চিন্তা নেই। সব বলব। একটু পা চালিয়ে চল, ওখানে বসে বলব।

নীরবে কতককটা হাঁটার পর এলাম একটা সুন্দর বাড়ী আর বাগানের ধারে। আমি প্রশ্ন করলাম, এটার নাম কি ?

কুইন্স প্যালেস এ্যাণ্ড গ্রীন টাওয়ার।

বাড়ী দেখতে দেখতে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম, শুনতে পেলাম ইণ্ডিয়ানা ইণ্ডিয়ানা বলে কে যেন ডাকছে। ফিরে তাকাতে দেখি লোকটি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল।

কাছে গিয়ে ব'ললাম—কি ব্যাপার ইণ্ডিয়ানা! কেন আমার কি নাম নেই ?

'নিশ্চয় আছে কিন্তু জেনে লাভ নেই, ভুলে যাব। তার থেকে ইণ্ডিয়ার মানুষ ইণ্ডিয়ানা।

হেসে বললাম আপনি কি ?

আমি ফরেনার।

সে কি এ দেশের নন ?

না, আমি জাতে জু। যাক সে কথা, এসো সেই পাথর দুটো দেখাই।

একটু হেঁটে বাগানের দেওয়ালের কাছে গেলাম, দেখলাম গাছের তলায় পিঁড়ের মত দুটো পাথর রয়েছে, একটা সাদা, একটা লাল।

লোকটি ডাকল, এসো, বসবে।

ব'সলাম। কাটল কিছুক্ষণ।

'এই বাড়ীটা দেখছ, এরই একটা ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছিল, লোকটি আস্তে আস্তে সুরু করল। অনেকে অনেক ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু আমি শুনিনি, টাওয়ারে থাকতে এলাম। সত্যি কথা বলব, প্রথম রাতটা কেমন এক অস্বস্তিতে কাটল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে ছিলাম। পরের রাতে কিন্তু কোন ভয় বা অস্বস্তি হয়নি, শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটু পরে শুনলাম গীর্জার পেটা ঘড়িতে দুটো বাজল। আমি উঠে পড়লাম। বাইরে বেরলাম। চাঁদের আলোয় যেন দিন হ'য়ে আছে, জুন মাসে, শীতও নেই। সেদিনই বিকেলে এই পাথর দুটোকে আবিষ্কার করেছিলাম, বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে ওখানে বসলাম।

লোকটি থামল। গল্পের রেসা কেটে যাবে ভেবে আমিও চুপ করেই রইলাম।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম। লোকটি সুরু করল। কতক্ষণ ঠিক জানি না। ভাবছিলাম নিজের কথা। কি একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে প'ড়ে আছি। এর কি শেষ আছে। ভাবতে ভাবতে এক সময় কুইন্স প্যালেসের দিকে চোখ প'ড়তেই চমকে উঠলাম। শাদা পোষাক পরা এক মহিলা বেরিয়ে আসছে। তার গায়ে হীরের গয়নার ওপর চাঁদের আলো প'ড়তে ঝলসে উঠছিল। এত রাতে মহিলাটি কি দয়িতের সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে নাকি? কে এই মহিলা? রাজ পরিবারের কেউ এখনও এখানে থাকে নাকি?

লোকটি থামল, কিন্তু আমি এবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। তাগিদ দিয়ে বললাম, তারপর কি হলো।

তারপর? তারপর দেখি মেয়েটি এদিক, ওদিক দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। এবার তো আমাকে ধরবে, অন্যায় ভাবে আমি এখানে আছি। রাতে তো এখানে থাকার নিয়ম নেই।

মেয়েটি ক্রমশঃ আরও কাছে এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করল, তুমি কি ডুডলেকে দেখেছ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, আমি জানি না।

মেয়েটি হতাশ ভাবে আমার পাশে ঐ পাথরটায় বসে পড়ল, যেটায় তুমি বসে আছ। আমি এবার ভীষণ ভয় পেলাম। তবু সাহস করে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম, ডুডলে তোমার কে হয়?

লাজুক হেসে মেয়েটি বলল, আমার স্বামী,…

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? তোমাকে দেখে তো মনে হয় না।

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে বলল—বিয়ে না হবার কি আছে? আমার তো বয়স সতেরো বছর হলো।

তোমার স্বামী কোথায় গেছে, তোমাকে বলে যায়নি?

না, ও যে আমার ওপর রাগ করে আছে…আচ্ছা তুমিই বল, প্রবল প্রতাপ শ্বশুরের ওপর কি আমি কথা বলতে পারি! ডুডলে ভাবল আমার লোভ। কিন্তু আমি তো এসব কিছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম শান্ত একটা পরিবেশ, নদীর ধার আর ছোট্ট একটি কুঠির—কে চেয়েছিল এই চমক্ দমক, এই হীরের ঝলকানি। শ্বশুরকে কি বলব? নিজের বাবার পায়ে পড়ে বলেছিলাম, আমাকে মুক্তি দাও, আমার কিছু চাই না। বাবা হেসে উঠে বলেছিলেন, মুক্তি! মুক্তি কোথায় পাবে? লোভের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। সেই মুহূর্তে বাবাকে আমার মানুষ বলেই মনে হয়নি, মনে হয়েছিল রাক্ষস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠে বললে—ছাড়লে না, বাবা কাউকে ছাড়লে না, আমাকে ডুডলে কে—সবাইকে বন্দী করলে।

আমি কি করব ভেবে পেলাম না। সান্ত্বনা দেবার মত করে বললাম, যা হবার হয়ে গেছে, এখন তো তুমি মুক্তি পেয়েছ।

আস্তে আস্তে চোখ মুছে মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, মুক্তি পেয়েছি। তাই তো ডুডলেকে খুঁজছি।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—মুক্তি পাবার পর ডুডলে তোমার সঙ্গে দেখা করিনি?

—না, তার অভিমান হয়েছে। অথচ সে যে আমাকে ভীষণ ভালবাসতো। যখন বন্দী ছিল তখন পাথরের দেওয়ালে শুধু লিখেছে 'জেন' 'জেন'।

তোমার নাম বুঝি জেন?

হ্যাঁ, আমার নাম লেডি জেন গ্রে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। লেডিজন গ্রে আজ এখন আমার পাশে।* কখন যে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম বুঝতে পারিনি। হঠাৎ আসা ভয়ের স্রোতটা একটু সরে যেতে আমি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন ক'রতে গিয়ে দেখি আমার পার্শ্ববর্তিনী কখন উঠে গেছে।

তার সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে চোখে প'ড়ল কুইন্স হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো যতই বেশী হক তবু একজনকে স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়, আশ্চর্য, আমি জেন গ্রেকে স্পষ্ট দেখলাম। অবাক আরও হলাম এই ভেবে যে এত তাড়াতাড়ি ও কি করে ওখানে গেল। ভাবলাম বারান্দার নিচে গিয়ে ওকে ডাকব। ও কি বলতে চায় শুনব। কিন্তু হলো না। পা চালিয়ে যখন বারাণ্ডার নিচে এলাম, জেন তখন সেখান থেকে চলে গেছে।"

মন্থর পায়ে ঘরে ফিরে এসেছিলাম। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হয়নি। ভোরবেলা দরজায় টোকা পড়তে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিলাম। অচেতন মন বোধহয় জেন গ্রেকে দেখতে চাইছিল। না, জেন আসেনি, এসেছিল আমার বন্ধু ফ্রান্সিস। ও বলল—ভোর ভোর ডেকে দিচ্ছি, কারণ আমি চাই না কেউ জানুকে তুমি রাতে এখানে থাক।

বেশ তো, আমি চলে যাচ্ছি।

না, না, যাবার দরকার নেই, মুখ ধুয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি চা খাওয়াব।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে চা নিয়ে বসলাম। প্রথমেই প্রশ্ন করল—"ভয়টয় পেলে নাকি?

কি জানি কেন 'জেন গ্রের' কথা বলতে আমার ইচ্ছা হলো না, চেপে গেলাম। বললাম—না, ভয় পাইনি তো।

ও অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে তোমার ঘুম না হওয়া লাল চোখ দেখলেই বোঝা যায় তুমি ভয় পেয়েছ। এখন লজ্জায় স্বীকার করছ না।

জোর প্রতিবাদ করে বললাম আমি মোটেই ভয় পাইনি, তবে নতুন জায়গায় ভাল ঘুম হয়নি, তাই বোধহয় চোখ···

সে বাধা দিয়ে বলল—ঠিক আছে তুমি না হয় ভয় পাওনি, কিন্তু কিছু দেখনি বা কিছুই শোননি!

কি শুনব?

লোকে যা শোনে, যেমন, হেল্প হেল্প বলে কেউ চিৎকার করছে কিম্বা ভারি জিনিষ পড়ার শব্দ, জলে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ, এমনি কত কিছু। তুমি কিছু দেখতেও পাওনি? যেমন ভারি ভারি বুট পরা পা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা পোষাক পরা কবন্ধের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে কিম্বা দুটি কিশোর জানলার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে···?

আমি জেন গ্রের কথা চেপে বললাম—না ভাই, আমি কোন শব্দ শুনিনি বা কাউকে দেখিনি।

আশ্চর্য!

এক রাতেই কি আর সবাই দেখতে পায়? হয়তো আরও দু-এক রাত থাকতে হবে, তা হলে দেখা পাব।

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলে আরও থাকবে? এটা কিন্তু বেআইনী। ধরা পড়লে আমাদের দুজনেরই সাজা হবে। দরকারকি ওসব আত্মাদের মুখোমুখি হবার।'

আমি ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্যে বললাম—আত্মাদের আর কাজ নেই যুগ যুগ এখানে বসে থাকবে।

ফ্রান্সিস চটে উঠে বলে—বাজে বক্‌বক্ করো না। যা জান না তা নিয়ে কথা বলো না।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে শান্ত করার জন্যে বলি—আর কখনও এমন কথা বলব না, তুমি আমাকে দয়া করে কয়েকদিন থাকতে দাও।

ফ্রান্সিস প্রথমে রাজি হয়নি। পরে ব'লল—ঠিক আছে, যাক কদিন। তবে তার আগে টাওয়ারের ইতিহাসটা জেনে নাও।

আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে বললাম—বল না, শুনি। আমার খুব আগ্রহ।

ফ্রান্সিস বলতে সুরু করে—একাদশ শতাব্দীতে নরম্যান রাজা প্রথম উইলিয়াম, উইলিয়াম দ্য কনকারার লণ্ডন শহরকে দৃঢ় করার জন্যে এই দুর্গের পত্তন করেন। তখন এটি রোমানদের করা দেওয়ালের মধ্যেই ছিল। দিনে দিনে এর রূপ বদলাতে থাকে। ১৮ একর জমি রয়েছে টাওয়ার অব লণ্ডনে। ওই যে দূরে সাদা গম্বুজটা দেখছ, ওটার নাম হোয়াইট টাওয়ার, নরম্যানরা করেছিল। এখন নরম্যানদের করা ঐ একটিমাত্র টাওয়ারই রয়েছে!

ইতিহাস শুনতে শুনতে কতকটা অধৈর্য হয়ে বললাম আর শুনতে চাই না। আমি নিজে দেখে বুঝে নিতে পারব! টাওয়ার অব লণ্ডন আর কি রাজা রাজড়াদের বন্দীশালা!

ফ্রান্সিস আমার কথার প্রতিবাদ করে বলেছিল—ও কথা বললে টাওয়ারের অপমান করা হবে।

—কেন এটা বন্দীশালা নয়? এখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি?

নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে এর জন্ম শুধু এইজন্যেই হয়নি। নরম্যানদের সময়

এর কাজ ছিল অনেক রকমের যেমন, এটা রাজপ্রাসাদ, মিণ্ট, বন্দীশালা ইত্যাদি। সেজন্যে বলতে পার দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ।

—বুঝলাম সবই, তবু টাওয়ার অব লণ্ডনকে বধ্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।

—তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, এটা বধ্যভূমিই। ১৪৬৫ সালে চতুর্থ এডওয়ার্ড প্রথম এখানে বধ্যমঞ্চ তৈরী করান। অবশ্য তার অনেক অনেক দিন আগে থেকে এখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'তো!

—থাক, আর শুনতে চাই না এর ইতিহাস। চলুন ঘুরে ঘুরে দেখি।—বাধা দিয়ে আমি বলি।

ভদ্রলোক একটু চুপ করলেন, তারপর আমার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—জান ইণ্ডিয়ানা, হয় আমি এখানে কিছু পাব, না হলে শেষ হ'য়ে যাব।

—কি খুঁজছেন আপনি?

—বলেছি তো, যারা শাস্তি পেয়েছে তারা সত্যিই অপরাধ করেছিল কিনা কিম্বা কতটা করেছিল জানব!

—তাতে লাভ কি?

—আছে। আমাদের বংশের একজন বিনা অপরাধেই বলতে গেলে প্রাণ দিয়েছে।

—কত দিন আগে?

—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়।

—এতদিন পরে সে খবর জেনে আপনার কি লাভ?

—জানতে চাই কেন সে বন্দীশালা থেকে সাবমেরিনে করে পালাতে গিয়েছিল।

—মৃত্যুর ভয়ে।

—যখন পালাচ্ছিল, তখন তো তার ওপর মৃত্যুদণ্ড ছিল না। পালাল বলেই তো তার মৃত্যুদণ্ড হলো!

—কি নাম ছিল তাঁর?

—রোজার ক্যাসমেণ্ট। থাক এ কাহিনী। এবার চল অন্য টাওয়ারগুলো ঘুরে দেখবে।

উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করি।

কতকটা নীরবে হাঁটার পর আমিই প্রশ্ন করি—আচ্ছা মিঃ ক্যাসমেণ্ট, অন্য যে সব টাওয়ার রয়েছে সেগুলোতেও কি আপনি কিছু দেখেছেন ?

প্রশ্ন শেষ করে তাঁর দিকে তাকাতে দেখি তিনি বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—কি হলো, কি দেখছেন ?

—তুমি আমার নাম জানলে কি করে ?

—বাঃ, আপনি তো এইমাত্র বললেন আপনাদের বংশের একজনের নাম রোজার ক্যাসমেণ্ট, তাই।

—ঠিক ধরেছে তো ! যাক্, এবার আসি টাওয়ারের কথায়। সব বাড়ির রহস্য বা অলৌকিক ঘটনা আমি দেখিনি, তবে এর প্রতিটি পাথরের কথাই আমি জেনেছি, সংগ্রহ করেছি।

এবার আমি একটু অবিশ্বাসের সুরেই বলি—আরও কত প্যালেস আছে, দুর্গ আছে তার সঙ্গেও এমনি রক্তের কাহিনী জড়িয়ে আছে, তবে কি সে সবই ভূতুড়ে বাড়ী !

—দেখো, ভূতুড়ে বলে তাচ্ছিল্য করো না ! তারাও তো একদিন আমাদের মতই ছিল, শরীর ত্যাগ করলেই কি তার কোন দাম থাকবে না ?

—আপনি চটছেন কেন ? আমি তাদের সম্বন্ধে কোন অসম্মান পোষণ করি না।

অল্প একটু হেঁটে পাথর গাঁথা একটা গোল গম্বুজ আর চৌকোনা বাড়ির সামনে এলাম। গোল বাড়িটা দেখিয়ে মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন এই গম্বুজটির নাম ওয়েকফিল্ড টাওয়ার। আর পাশেরটির নাম ব্লাডি টাওয়ার।

নামটা কানে কেমন লাগল তাই প্রশ্ন করলাম, এমন লোমহর্ষক নাম হলো কেন ?

—সত্যি কথাই, লোমহর্ষক নাম। এমন নাম কিন্তু আগে ছিল না। তখন একে বলা হতো গার্ডেন টাওয়ার। পাশে সুন্দর একটা বাগান ছিল, বন্দীরা এখানে বেড়াতো। কিন্তু টাওয়ারের সে সুনাম রইল না, ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী প্রেসীর আত্মহত্যার পর থেকেই, এমন একটা ভয় জাগান নাম হ'লো। অবশ্য এই টাওয়ারের গায়ে রক্ত লেগেছে অনেক অনেক দিন আগে। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাও আবার নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—এখানে কি শিশু বলি হতো ?

—শিশু বলি হতো না। একজন নিষ্ঠুর কাকা, তার ফুলের মত ভাইপোদের হত্যা ক'রেছিল।

—কারণ ?

—লোভ। সে এক বিরাট কাহিনী। হয়তো তোমরা পড়েছো। পঞ্চম হেনরীর পর থেকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে যে সব রাজা এলেন তাদের যোগ্যতা তেমন ছিল না। পঞ্চম হেনরী হঠাৎ মারা যান, তখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর ছেলে ষষ্ঠ হেনরীর বয়স মাত্র ন মাস। কাজেই স্বার্থান্বেষীরা এই সুযোগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর মধ্যে ডিউক অব ইয়র্ক বিশেষ শক্তিমান ছিল। এছাড়া ছিল ডিউক অব গল্স্টার, ওয়ার উইক ইত্যাদি। ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব ইয়র্ক, এডওয়াড নাম নিয়ে সিংহাসনে বসল, ষষ্ঠ হেনরীকে হত্যা করে। রাজত্ব করেছিল ২৮ বছর কিন্তু শান্তি হয়নি কোন দিন। ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন, তখন তাঁর বড় ছেলে পঞ্চম এডওয়াডের বয়স ১২ বছর আর ছোট ছেলে ৯ বছরের। নামে মাত্র সিংহাসনে বসল বালক পঞ্চম এডওয়ার্ড, কিন্তু তাও বেশী দিন সহ্য হলো না তার কাকা। ডিকর্ড আর গলষ্টার ভাইপোকে সরিয়ে সিংহাসনে বসল নিজে।

তা কি করে হলো ? কারণ কি দেখালে পঞ্চম এডওয়ার্ডকে সিংহাসন থেকে সরাবার ?

দুরাত্মাদের কি ছলের অভাব হয় ? ব'লল চতুর্থ এডওয়ার্ডের বিয়ে অসিদ্ধ, কাজেই তাদের ছেলেকে বৈধ সন্তান বলা হবে না। বালক পঞ্চম এডওয়ার্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো টাওয়ারে। দু'মাস আগে বাবা মারা গেছে, তারপরই মা, মা, ছোট ভাই আর বোনেদের কাছ থেকে তাকে পাঠান হলো নির্বাসনে। একা একা বেচারা ঘুরে বেড়াত ঐ বাগানে। অল্প কিছুদিন বাদেই ছোট ভাইটিও এলো। দুঃখের মধ্যে তবু সান্ত্বনা। বালক দুটি কখনও দাঁড়ায় ছোট্ট জানলায়, কখনও বেড়ায় বাগানে। মাঝে মাঝে তাদের কাকা আসে। এমনি চলছিল। এদের দেখা শোনা করত একজন বৃদ্ধ পরিচারক। তার অত্যাধিক স্নেহ ছিল এই দুটি হতভাগ্য বালকের প্রতি। একদিন সন্ধ্যা হয় হয়, বৃদ্ধ নিজের কুঠরীর বাতি জ্বালাচ্ছিল এমন সময় শুনল দুটি বালক ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে ? তোমরা এখানে এলে কি করে ?

কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে দেখে তারা নেই। পরিচারক তাড়াতাড়ি

দৌড়ালো তাদের ঘরের দিকে। গিয়ে দেখল ঘর ফাঁকা। গেল কোথায়? চারিধার খুঁজল। সে একা নয়, রক্ষীরাও খুঁজতে সুরু করল। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। খবর গেল কাকার কাছে। লোকজন নিয়ে কাকা, তৃতীয় রিচার্ড এসে সারা প্রাসাদ খোঁজানোর ব্যবস্থা করল। টেমস নদীতেও জাল ফেলা হলো, কিন্তু বৃথা। কোন হদিসই মিলল না। অথচ তাদের উপস্থিতি জানতে পারে, হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পায় কিন্তু পরক্ষণেই হারিয়ে যায়। ক্রমশঃ মানুষ তাদের কথা ভুলে যেতে লাগল।

—কোথায় গেল ছেলে দুটি? কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করি।

—হারিয়েই গেল বলতে পার। কারণ এই ঘটনার অনেক দিন পরে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ টাওয়ারের একটা সিঁড়ি ভাঙ্গার সময় মাটির নিচে থেকে এক বিশাল বাক্স পাওয়া যায়। মিস্ত্রী মজুর যারা ওটা পেয়েছিল তারা গুপ্তধন মনে করে খুলেই ভয়ে দশ পা পিছিয়ে গেল, দেখল ভিতরে দুটি বালকের কঙ্কাল। এগুলি যে কার কঙ্কাল তা তারা বুঝতে পারেনি, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখেই বলেছিল এ দুটি চতুর্থ এডওয়ার্ডের দুই ছেলের দেহাবশেষ। সকলেই বুঝল এ কাজ তাদের কাকার, কিন্তু শাস্তি পাবার অনেক অনেক আগে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। তৃতীয় রিচার্ডের গুণ ঐ টুকুই নয়। শুধু ভাইপো নয় এর আগেও নিজের হাতকে রক্তাক্ত সে করেছিল।

—ডিউক কাকে মেরেছিল, ওর দাদাকে?

—না, ওর দাদা আপনিই মারা গিয়েছিল। ও মেরেছিল ষষ্ঠ হেনরীকে। তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এই ওয়েকফিল্ড টাওয়ারে। শুধু কি বন্দী? তার ছেলেকে হত্যা করে খবর পাঠান হলো, ভেবেছিল হয়তো এই আঘাতেই হেনরী মারা যাবে। কিন্তু যখন দেখা গেল শোক হলেও তার মৃত্যু হয়নি, তখন গ্লসটারের ডিউক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বার দিন বাদে সকালে ষষ্ঠ হেনরীর ঘরে ঢুকে রক্ষীরা দেখে মৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হলো।

—ওয়েক ফিল্ড টাওয়ারের সঙ্গে যখন এমনি রক্তাক্ত কাহিনী জড়িয়ে আছে তখন তার নামই বা ব্লাডি হলো না কেন?

—তা ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয় ব্লাডি টাওয়ারের রক্ত পিপাসা বেশী, তাই হয়তো ঐ নাম। এই তো স্যার ওয়ালটার রালের কথাই

ভাব না কেন। অতবড় একটা প্রতিভা, বীরত্ব, সৃজনী শক্তি—সব কিছু এই চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্ধ হ'য়ে রইল।

—স্যার ওয়ালটার র‍্যালের কথা 'হিস্ট্রি তব দি ওয়ার্লড'এ পড়েছি, জেনেছিলাম রাজা প্রথম জেমসের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

—ঠিক, কিন্তু তাঁর আগে যে এক বড় কাহিনী আছে, সেটা কি জান?

—কোন কাহিনী বলছেন, বুঝতে পারছি না। বলুন না শুনি।

—বলব, কিন্তু তাতে মহিলাদেব প্রতি একটু হয়তো কটাক্ষ করা হবে, তুমি কিছু মনে করবে না তো?

হেসে বললাম—কিছু মনে করব না কারণ, একজন মহিলার দোষ গুণ নিয়ে সমস্ত মহিলা জাতকে আমি বিচার করি না। তাছাড়া আমি বিদেশে এসেছি দেখতে, জানতে, কাজেই কোন কাহিনী শুনেই ভাবব না যে এটা মেয়ে জাতের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। আপনি বলুন।

—স্যার ওয়ালটার র‍্যালে শুধু কবি বা লেখক ছিলেন না, তাঁর মধ্যে ছিল এক উদাসী সত্তা যে সর্বদা নতুন কিছু জানার জন্যে নতুন কিছু পাবার জন্যে তাকে ব্যস্ত করে তুলত। নিত্য নতুন রোমাঞ্চকর খোঁজে থাকতেন তিনি। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা শেষ ক'রেই ১৫৬৯ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে নেমে পড়লেন। পরেই তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই স্যার হামফ্রে গিলবার্টএর সঙ্গে ওয়েষ্ট ইনডিস্ অভিযান বেরলেন। পরের বছর ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আয়ালাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি এলেন রাজসভায়। তখন সাম্রাজ্ঞী কুমারী এলিজাবেথ এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। ঠিক তখনই, সুপুরুষ, বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিদৃপ্ত ওয়ালটারের প্রবেশ। ব'লতে গেলে প্রথম দর্শনেই তাঁকে ভাল লেগে গেল এলিজাবেথের।

আমি মাঝখানেই ব'লে উঠলাম কাউকে ভাললাগাই কি কটাক্ষ করা?

—না, না, তা হবে কেন? আগে সবটা শোনো, তারপর।

—ঠিক আছে বলুন।

এলিজাবেথ নিজে সাহিত্য ভালবাসতেন কাজেই ওয়ালটারের মন পেতে দেরী হলো না। অবশ্য মন পাবার জন্যে স্যার র‍্যালে অনেক কিছুই করতেন। শোনা যায় রানীর হাঁটার পথে কাদা আছে দেখে নিজের গায়ের জামা খুলে বিছিয়ে দিয়েছিলেন। এলিজাবেথ বুদ্ধিমান, সাহসী, সুদর্শন যুবকটির প্রতি ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগলেন। রানীর সব থেকে পছন্দ ছিল

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি। তাঁর কথার তাৎক্ষণিক চমকপ্রদ উত্তর দেবার ক্ষমতা সেই সময় স্যার র‍্যালের মত কারুর ছিল না। রানী মনের খোরাক পেতেন ওয়ালটারের কথায় কবিতায়। একবার এলিজাবেথ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা ওয়াটার, তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কবে থেকে বন্ধ করবে ?

—আপনি যবে থেকে দান করা বন্ধ করবেন।

এলিজাবেথের কাছে তখন সে আর ওয়ালটার নয় সে 'ওয়াটার'। এমনি কাটছিল স্যার র‍্যালের দিন আনন্দেই, অবশ্য এত সুখ অন্যের ঈর্ষা বাড়িয়েছিল, বলাই বাহুল্য। এদের মধ্যে তরুণ আর্লের গাত্র দাহই ছিল বেশী। তবু তার প্রতিপত্তি ক্রমবর্দ্ধমানই ছিল। অনেক দিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রাজ দরবারে থেকে স্যার র‍্যালের মন নতুন নতুন অভিযানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু রানী মোটেই পছন্দ ক'রছিলেন না এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে তাঁর স্নেহধন্য ওয়াটার যাবে। স্যার র‍্যালের বৈমাত্রেয় ভাই স্যার গিলবার্ট গেলেন উত্তর আমেরিকা অভিযানে। টাকা দিলেন ওয়ালটার। তিনি চেয়েছিলেন নব আবিষ্কৃত স্থানটিতে উপনিবেশ স্থাপন করবেন আর তার নাম দেবেন ভার্জিনিয়া। কুমারী রানীর স্মরণে।

মিঃ ক্যাসমেন্ট এবার থেমে, আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি ভাল লাগছে তো ?

—হ্যাঁ, লাগছে, তবে ভূতের গল্প কোথায়। এতো রাজা রানীর ইতিহাস।

ভদ্রলোক এবার জোরে হেসে উঠে বলেন—কি মুস্কিল, একটা প্রাসাদে এসেছ তার ইতিহাস জানবে না ? তুমি কি ভেবেছ যে খাঁচার মুরগীর মত প্রাসাদগুলোতে ভূত ডানা ঝাপটাচ্ছে।

—না, না, তা ভাবিনি, তবে জেন গ্রের পর আপনি তো আর একটাও ঘটনা বললেন না, তাই···।

বলব, আগে স্যার র‍্যালের কথা শুনে নাও। রানী তাঁকে এত পছন্দ করতেন যে তাঁর প্রতিটি লেখা পড়তেন, উত্তর দিতেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি শোনো। ওয়ালটার লিখেছেন—

'Fain would I climb, yet fear I to fall.'

এর পাদ পূরণ হিসাবে এলিজাবেথ লিখলেন—If thy heart fail thee, climb not at all.

রানী দুহাতে উজাড় করে দিয়েছিলেন জমি, বাড়ি, টাকা, অবশ্য র‍্যালেও

তাঁর প্রতি কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। দেখতে দেখতে দশ বছর পার হয়ে গেল, স্যার র‍্যালে জীবনের বৈচিত্র্য খুঁজছিলেন। ঠিক তখনই দেখা হলো এক নারীর, নাম তার এলিজাবেথ থ্রকমরটন।

এ কথা জানলেন রানী। তিনি একটি সাধারণ কথা মেনে নিতে পারলেন না। একজন নারী বোধহয় সহ্য করতে না পারে না তার প্রিয় বা স্নেহধন্য কেউ অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসুক।

প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম—তা কখনও সত্যি নয়। সব মেয়েই কি একরকম!

ক্যাসমেণ্ট হেসে বললেন—বলেছিলাম মেয়েদের কটাক্ষ করব যাক, এবার র‍্যালের কথা শেষ করি। রানী যখন ঘটনা জানলেন তখনই ওয়ালটারকে আর থ্রকমরটনকে টাওয়ারে বন্দী করে রাখলেন। সেই বছরেই মুক্তি পেলেন র‍্যালে তবে বুঝলেন রানীর আগের বিশ্বাস এবং ভালবাসা আর পাবেন না। এলিজাবেথ থ্রকমরটনকে বিয়ে করলেন র‍্যালে। সময় কাটতে লাগল।

রানী মারা যাবার পর প্রথম জেমস রাজা হলেন। এবার র‍্যালের শত্রুপক্ষ জোরদার হলো। ১৬০৪ সালে রাজার দুর্বলতার সুযোগে, অমাত্যদের পরামর্শে র‍্যালে বন্দী হলেন। থাকতেন এই ব্লাডি টাওয়ারে। অবশ্য তাঁকে সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছিল, স্ত্রী পুত্র রোজ আসত দেখা করতে।

দেখতে দেখতে বার বছর হয়ে গেল ওয়ালটারের। অশান্ত মানুষ, ছোট্ট জায়গায় বন্দী থেকে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত ওখানকার রক্ষীরা শুনত তার অহংকারী পা ফেলার আওয়াজ, আর পেতো উগ্র তামাকের গন্ধ। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে দোক্তা পাতার আমদানী তিনিই করেছিলেন। সে সময় তিনি রানীর সুনজরে ছিলেন তাই বন্ধু বান্ধবদের রূপোর পাইপে ভরে তামাক পাতা দিয়েছিলেন নেশা করার জন্যে।

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের দমন করার জন্যে জেমস ওয়ালটারকে মুক্তি দিলেন তার একটা কারণ ছিল যে সাহসী র‍্যালেকে ওরিনোকোতে সোনা খুঁজতে পাঠানোর। এই ব্যাপারে ওয়ালটারের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ হয়। জেমস এটা চাননি, তিনি স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছিলেন। র‍্যালে দেশে ফিরলে রাজা আবার তাঁকে টাওয়ারে বন্দী করেন। আগেকার অপরাধে শাস্তি স্বরূপ ১৬১৮ সালে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবেতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়।

—আচ্ছা। স্যার ওয়ালটার র‍্যালেকে কি এখনও দেখা যায়?

—আমি এখনকার কথা জানি না, তবে কিছুদিন আগে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলাম যে ব্লাডি টাওয়ারের একজন রক্ষী কিছুদিন আগে ঐ ঘরটি, যে ঘরে র‍্যালে থাকতেন সেটি ঝাড় মোছ করছিল। ওখানে ফায়ার প্লেসের ওপর স্যার র‍্যালের একটি সুন্দর ছবি টাঙ্গান আছে। সে সেটা ঝেড়ে উল্টো করে টেবিলের ওপর রেখে অন্য কিছু করছিল। হঠাৎ ভারি জুতোর আওয়াজ শুনে তাকাতে দেখে লম্বা একজন লোক স্যার ওয়ালটারের ছবিটা দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। টাঙ্গান হতে ফিরে দাঁড়াতেই দেখে লোকটি আর কেউ নয় স্বয়ং স্যার ওয়ালটার। তার জ্ঞান ফিরতে সে অন্য সকলকে প্রশ্ন করেছিল, যে, সত্যিই কি ছবিটা দেওয়ালে ঝুলছিল। তারা সকলেই বলল ছবি দেওয়ালেই ছিল।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট ব'ললেন—চল, এবার অন্য একটা টাওয়ার দেখাই।

—এখানকার কাহিনী কি শেষ হয়ে গেল ?

হেসে উত্তর দিলেন—এক একটা টাওয়ারের এক একটি বিশাল ইতিহাস। কিন্তু তোমার সময় তো সীমিত, কাজেই শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি। হয়তো মাঝে মাঝে আবার এদের কথা বলতে হবে।

চলতে চলতে বললাম—আপনার রাতের অভিজ্ঞতা বলুন না ততক্ষণ।

ধীরে ধীরে যেন কতকটা স্বগতোক্তির মত বললেন—যেখানে সেখানে বললে সে যে নেহাৎই গল্প হয়ে যাবে। যেখানকার যেটি সেখানে সেটি বলব যাতে তুমি নিজেও অনুভব করতে পার সেই সব অতৃপ্ত আত্মাদের দুঃখের কথা।

আমরা এবার এলাম বিশাল চতুষ্কোণ এক বাড়ীর সামনে। মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন এই সে বাড়িটা দেখছ, এর নাম হোয়াইট টাওয়ার। এটি খুব প্রাচীন যদিও তারপর এর অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় হেনরীর রাজত্বের সময় অনেক কিছু সংযোজন হ'য়েছিল। এর পাশেই ভজনাগার, নাম সেণ্ট জনস্ চ্যাপেল। তৃতীয় হেনরী এই চার্চে সুন্দর সুন্দর রঙিন কাঁচ বসিয়ে ছিলেন।

আচ্ছা, এটাতে কি রাজা রানীরা বাস করতেন ?

প্রথম দিকে করতেন, পরে এটাও বন্দীশালাই হয়ে উঠল। তৃতীয় হেনরী সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করলেন, কিন্তু বেশীদিন লাগল না তার গায়ে রক্তের ছাপ লাগতে।

—কি হয়েছিল ?

—হবে আর কি ; রাজার বিরাগ লাভ করেছিল। প্রথম তো, তাঁর প্রিয় এবং শক্তিমান মন্ত্রী হুবারট রাজার বিরাগ ভাজন হয়ে বন্দী হলেন, এলেন এখানে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় চোরকুঠরিতে কাটালেন জীবনের শেষ ক বছর। এরপর ১২৩৮ সালে উইলিয়াম লি ম্যারিসও রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ধরা পড়লেন এবং তাঁর অবস্থাও হলো হুবারটের মত।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট থামলেন। যেন দম নিলেন। তারপর আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন,—রক্তের ছাপ ঠিক ভাবে লেগেছিল এর কিছুদিন পরে। গ্রিফিথ নামে ওয়েলসএর একজন রাজকুমার, হেনরীর বিরাগভাজন হয়ে এলেন এখানে।

সেখানে তাঁকে অবশ্য শৃঙ্খলিত করে বাখা হয়নি, সম্মানের সঙ্গেই ছিলেন। তবে তাঁর খরচের জন্যে যে টাকা পেতেন তাতে তাঁর ইচ্ছা মত খরচ করা চলত না। গ্রিফিথ মুক্তিব উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তিন বছর সময় কেটে গেল। এই সময় তাঁরই এক পরিচারক ডারহামেব বিশপের বন্দীশালা থেকে পালানোর গল্প শোনাল।

গল্পটি এই রকম—দ্বিতীয় উইলিয়ামের মন্ত্রী এবং ডারহামের বিশপ ছিলেন র‍্যানউল্‌ফ ফ্ল্যাম্বর্ডে। উইলিয়াম মারা যাবার পর হেনরী (প্রথম) রাজা হলেন। তাঁর পার্শ্বচরেদের পরামর্শে র‍্যানউলফকে বন্দী করে তিনি পাঠালেন এখানে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে তিনি পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। ফ্ল্যামবার্ড জানলা থেকে দড়ি বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দিলেন, তারপর সাবধানে সেই দড়ি ধরে নিচে নেমে পালিয়ে গেলেন নরম্যাণ্ডি। পরে হেনরীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে বহুদিন ডারহামে ছিলেন। এই দড়ি এসেছিল তাঁর বন্ধুর সাহায্যে মদ্যবাহী নৌকায়। র‍্যানউলফ জানলা থেকে নামার আগে রক্ষীদের পানীয়ে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

কাহিনীটি গ্রিফিথের মনে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। কিন্তু দড়ি? তিনি নিজেই দড়ি তৈরী করলেন, চাদর, জানলার পর্দা ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, দড়ি ছিঁড়ে পাথরের প্রাচীরে পড়ে প্রাণ হারালেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১২৪৪ সালে। গ্রিফিথের পুত্রও বন্দী হয়ে আসেন। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, "বাবা মুক্তির যে পথ উদ্ভাবন করে সফল কাম হতে পারেননি, আমি সেই পথে সাফল্য আনব। আর বলতে গেলে সফলও হয়েছিলেন। দড়ি তৈরী করে নেমে পালিয়ে যেতে সমর্থও হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে

বাঁচা হয়ে ওঠেনি। কিছুদিন বাদে ধরা পড়েন এবং তাঁর শিরচ্ছেদ হয়। এতেই শেষ নয়, ঐ ছিন্ন মুণ্ড ব্লাডি টাওয়ারের মাথায় আটকে রাখা হয়। অনেকে বলেন অন্ধকার রাতে এক একদিন দেখা যায় টাওয়ারের চূড়ায় দেহহীন এক মুণ্ড হা হা করে হাসছে।

মিঃ ক্যাসমেণ্টের কথা শুনতে শুনতে আমার মন সুদূর লণ্ডন থেকে মুহূর্তে চলে এলো দিল্লীর কাছে, যেখানে চোরমিনার মিনারটির গায়ে অনেকগুলি ঘুলঘুলির মত গর্ত দেখে প্রশ্ন করেছিলাম, এগুলো কিসের জন্য। গাইড হেসে উত্তর দিয়েছিল এতে কোতল করা মাথা সাজিয়ে রাখা হতো। গাইড এমন হাল্কা ভাবে ঐ পাশবিক দৃশ্যের কথা বললেন, যেন মনে হলো তিনি বলছেন ঐ ঘুলঘুলিগুলিতে প্রদীপ দেওয়া হতো।

আমার অন্যমনস্কতা মিঃ ক্যাসমেণ্টের দৃষ্টি এড়ায়নি, প্রশ্ন করলেন—কি হলো কি ভাবছ ?

—না এমন কিছু নয়, ভাবছিলাম আমাদের দেশে মনুমেণ্ট আছে তাতে ছিন্ন মুণ্ড সাজিয়ে রাখা হতো. সেখানেও কি আঁধার রাতে দেহহীন মুণ্ডগুলি হেসে ওঠে ?

কথার গুরুত্ব না দিয়ে মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন—হাসতেও পারে। তারপর কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে, বলেন—রাজা রাজড়াব বা তাদের পরিষদের ভাল করাও মুস্কিল।

—এ কথা কেন বলছেন ?

—এখানকার একটা ইতিহাস মনে পড়ে গেল বলে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন—আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছরেরও আগের ঘটনা, তবু যেন মনে হয় কিছুদিন আগের।

—কার কথা বলছেন ?

—সার টমাস ওভারবুরি। জান এর কথা ?

জানালাম,—আমি ওনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট কাহিনী বলার মত করে বললেন—ওভারবুরি শিক্ষিত এবং স্পষ্ট বক্তা মানুষ ছিলেন। তাঁর এক বন্ধু ছিল সামারসেটের আর্ল। তিনি আবার রাজা প্রথম জেমস এর প্রিয় পাত্র ছিলেন। যা হক সামসটের আর্ল এসেকস্ এর কাউণ্টেস ফ্রন্সেস হাওয়ার্ডের সঙ্গে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ওভারবুরি জানতে পেরেছিলেন মহিলাটি লাস্যময়ী এবং প্রজাপতি স্বভাবের।

বন্ধুকে ভবিষ্যৎ দুঃখের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বলেছিলেন—"বন্ধু, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি ফ্রান্সেসে-এর সঙ্গে বড় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছ। দেখো তাকে যেন আবার বিয়ে করো না। সে উপপত্নী হতে পারে কিন্তু জীবন সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা তার নেই। সাবধান!

ফল হলো বিপরীত। সামারসেটের আর্ল রাজাকে গিয়ে নানান কথা মিথ্যা করে লাগলেন ওভারবুরি সম্বন্ধে। শুধু আর্লই নয়, রাজার কানে বিষ ঢাললেন কাউণ্টেস ফ্রান্সেস! ফল লাভ হতে সময় লাগেনি। বন্দী হলেন ওভারবুরি। এটুকুতেও যেন তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ হলো না। বিষ দিয়ে ব্লাডি টাওয়ারেই শেষ করা হলো ওভারবুরিকে। তিনি মারা গেলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে। বিষের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছিল তাঁর দেহে। সেই অবস্থায় কোন প্রকারে কাপড়ে মুড়ে চ্যাপেলের মধ্যে তাকে সমাহিত করা হলো। বিষ প্রয়োগে মৃত্যু! তাই তার অনুসন্ধান চলল বেশ কিছুদিন, তারপর এই অপরাধে বন্দী হলেন চারজন, যার মধ্যে এই টাওয়ারের প্রধান রক্ষক স্যার গ্রেভাস এলিউন এবং এক চিকিৎসকের বিধবা পত্নী মিসেস এ্যান টারনারও ছিলেন। এই চারজনেরই মৃত্যুদণ্ড হলো।

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে গল্প শুনছিলাম, এবার প্রশ্ন করলাম—এই চারজন, ওভারবুরিকে বিষ দিল কেন?

—এই তো মজা, ওভারবুরির মৃত্যুর ব্যাপারে এরা হয়তো সাহায্য কিছু করে থাকতেও পারে। কিন্তু আসল দোষী ওরা নয়।

—তবে কারা?

—সামারসেটের আর্ল আর ফ্রান্সেস, তারা তখন স্বামী স্ত্রী।

—বিয়েই যখন করল, তখন আর ওভারবুরিকে হত্যা করার কি প্রয়োজন?

—শত্রুর শেষ রাখতে চায়নি, এই আর কি!

—ওদেরও কি মৃত্যুদণ্ড হলো?

মিঃ ক্যাসমেণ্ট, মাথা দুলিয়ে বললেন—না, তারা অন্যায় স্বীকার করার জন্যে বেকসুর খালাস পেল।

—হঠাৎ অন্যায় স্বীকার করল কেন?

—লোক বলে, সামারসেট আর ফ্রান্সিসকে ওভারবুরির আত্মা নাকি জোর করিয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়েছে। তারা কতকটা ভয় পেয়েই রাজাকে জানিয়েছিল কিভাবে ওভারবুরিকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছিল।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলেন—আমার ধারণা ; যারা শাস্তি পায় তারা সব সময়েই যে অন্যায়ের জন্যে পায় এমন নয়, কত ভুল, কত অন্যায় যে থেকে যায় তার হিসাব কেউ রাখে না।

বললাম—শুধু আপনাদের দেশে নয়, সব দেশে, সব কালেই এমন ভুল, এমন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অন্যায় হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হবে, এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

—ঠিক বলেছ।··চল আর ব্লাডি টাওয়ারের কথা না বলে অন্যত্র যাই।

একটু হেঁটে ডানদিকে ঘুরেই এসে পড়লাম একটি ভজনাগারের সামনে, "দি চ্যাপেল রয়েল অব সেণ্ট জন।" মিঃ ক্যাসমেণ্ট জানালেন এটি টাওয়ার অব লণ্ডনের জন্ম সময় থেকেই প্রায় রয়েছে, ১০৭৭ সালে এর সৃষ্টি।

চ্যাপেলের মধ্যে গেলাম। পাথরের তৈরী ভজনাগারের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা রয়েছে। মিঃ ক্যাসমেণ্ট দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা কতকগুলো লেখার দিকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন—এগুলো কারা লিখেছে জান?

না তো।

এখানে যারা বন্দী থাকত, সেইসব হতভাগারা পাথর কেটে কেটে এইসব লিখত, বিচিত্র কারুকার্য করত?

—কেন?

—ঠিক জানি না, মনে হয় অন্ধকার বন্দী জীবনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার এ একটা পদ্ধতি।

ঘুরতে ঘুরতে খিলানের মধ্যে রাখা একটা মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে তার নাম পড়তে লাগলাম, টমাস মোর····।

—ইণ্ডিয়ানা, তুমি যদি ভয় না পাও তবে একটা গল্প বলব।

আমি তার দিকে ফিরে বলি—এই দিনের বেলা, চারিধারে লোক, সূর্যের আলো···এর মধ্যে ভয় পাব কেন? আমি কি শিশু!

—ঠিক আছে বলছি। স্যার টমাস মোরের কথা জান তো?

—জানি, তবু আপনি একটু বলুন শুনি।

স্যার টমাস মোর এক কথায় বলা যায় বুদ্ধিজীবি ছিলেন। লণ্ডনেই জন্ম, লণ্ডনেই শিক্ষাদীক্ষা। তিনি একাধারে লেখক, আইনবিদ, ঐতিহাসিক, ধর্মযাজক—সব কিছু। জন্ম হয়েছিল ১৪৭৮ সালে, ১৫০৪ সালে তাঁর বিয়ে

হলো। শিক্ষা, সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে বেশ ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধল—অষ্টম হেনরী যখন প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্যে ব্যস্ত, সেই সময় তিনি নাম শুনলেন টমাস মোরের। রাজার নজরে পড়ে তিনি স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। টমাস মোর, রানী ক্যাথেরিনকে ত্যাগ করা বৈধতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু রাজা যখনই নিজেকে পোপের থেকে ক্ষমতাবান বললেন তখনই টমাস মোরের সঙ্গে অষ্টম হেনরীর বিরোধ হলো। রাজরোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা কতটুকুই বা হয় সাধারণ লোকের। বন্দী হয়ে এলেন টাওয়ারে। এক বছর বন্দী রইলেন সন্ট টাওয়ারে। তারপর ১৫৩৫ সালে হলো তাঁর শিরশ্ছেদ।

—কি গল্প বলবেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ, বল্‌ছি, টমাস মোরের সমাধি এখানেই দেওয়া হলো?

—এখানে মানে? এই চ্যাপেলে?

—হ্যাঁ, এ চ্যাপেলে তো কম, সব থেকে বেশী সেন্ট পিটার চ্যাপেলে। সে কথায় পরে আসব। টমাস মোরকে কবর দেবার পর কয়েক দিন কেটেছে, তারপর চ্যাপলিন (চ্যাপেলের অধিকারী) দেখেন যে, যাজকের দণ্ড হাতে নিয়ে টমাস মোর চ্যাপেলে ঘুরছেন। বলাই বাহুল্য তিনি ভয়ে জ্ঞান হারালেন। এই ঘটনার দু চারদিন বাদে সন্ট টাওয়ারে, যেখানে টমাস মোর বন্দী ছিলেন সেখানে তাঁকে দেখা গেল। বন্দীশালার রক্ষী বেশ সাহসী, সে তাঁর দিকে প্রশ্ন করল—আপনি আবার এখানে কেন?

কোন উত্তর দিলেন না। রক্ষী দেখল তাঁর মাথাটা হঠাৎ উড়ে গেল আর সেই আধো অন্ধকার কারা গৃহ এক অট্টহাসিতে ভরে উঠল। সব সাহস কোথায় চলে গেল, রক্ষীটি জ্ঞান হারাল।

মাঝে মাঝেই টমাস মোরকে দেখা যেতে লাগল। যখনই দেখা যায় তখনই মনে হয় অস্থির। তখন সকলে চিন্তা করতে লাগলেন কেন তিনি অস্থির। এর মধ্যে চলে আত্মার শান্তি কামনা। ক্রমে ক্রমে তাঁর আসা কমে যেতে জ্ঞানীগুণীরা আবিষ্কার করলেন যে স্যার মোরের দেহ এখানে কবরস্থ করা হ'লেও তাঁর মুণ্ডটি অন্যত্র সমাধি দেওয়া হয়েছিল। মোর তাই অস্থির।

—মোরের এই মূর্তিটা এতদিন পরে,—দীর্ঘ চারশ বছর পরে করার অর্থ কি?

—তাঁকে সম্মান জানান। চল এবার অন্য দিকে যাই। গীর্জার ওপাশেই 'হোয়াইট টাওয়ার' যেটার কথা একটু আগে বলছিলাম, জান ঐ টাওয়ারে ধর্মের

নামে যে কত মানুষ নির্যাতিত হয়েছে কি বলব। তুমি নিশ্চয় উইট বিপ্লবের কথা জান।

—হ্যাঁ, সামান্যই, ক্যাথলিক মেরীর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যানরা যে বিরোধ করেছিল, যার পরিচালকের নাম ছিল টমাস উইট।

—ঠিকই বলেছ। হয়তো এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কোন ফল হয়নি, তবে পরোক্ষ ফলেই বোধহয় রানী এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি আবার বললেন—দেখো, পৃথিবীতে যত অধর্ম হয়েছে তার অধিকাংশই ঘটেছে ধর্মের নামে। ১৫৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে টমাস উইটের নেতৃত্বে মেরীর বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছিল। তাঁরা মেরীর আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত, সঙ্গসাথী সহ উইট হলেন বন্দী! এই উপলক্ষে ভবিষ্যৎ রাণী এলিজাবেথকেও বিদ্রোহের অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল তাই মৃত্যুর আগে টমাস উইট বলে গিয়েছিলেন, 'আমার এই বিদ্রোহের সঙ্গে কুমারী এলিজাবেথের কোন যোগ নেই। সে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দোষ।' বেঁচে গেলেন এলিজাবেথ।

—এইজন্যেই তো মেরীর নাম হয়েছিল ব্লাডি মেরী। অবশ্য শুধু এইজন্যেই নয়, মেরী বিদ্রোহ দমনের নামে কত শ্রদ্ধেয় মানুষের প্রাণ নিয়েছেন। বিশপ ল্যাটিমের, এবং সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ ক্র্যানিমারকে যখন অক্সফোর্ডে পুড়িয়ে মারা হলো তখন মেরীকে ঐ নাম ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যেত?

কিছুক্ষণ থেমে কি ভেবে মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন—শুধু ধর্মের নামেই নয়, অন্ধ কুসংস্কারের বলি যে কত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। ডাইনী বা মন্ত্র সিদ্ধ দুটি শব্দ যেন ভয়ের প্রতিমূর্তি। আমার মনে হয়, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে এসেও এখানকার মানুষ ঐ ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

কথা শেষ করে মিঃ ক্যাসমেণ্ট হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। একটু পরে গোলাকৃতি পাথরের একটি বাড়ীর সামনে এলাম। উনি জানালেন—এই টাওয়ারটির নাম 'সল্ট টাওয়ার'। আগে এর নাম ছিল জুলিয়াস সীজার টাওয়ার,। টাওয়ার অব লণ্ডনের যত টাওয়ার আছে তার মধ্যে বুচহোম টাওয়ার বাদ দিলে সল্ট টাওয়ারের মত এত সুন্দর ভাস্কর্য আর কোথাও নেই। এরই একটি দেওয়ালে একটি কুষ্টির ছক কাটা আছে। ১৫৬১ সালে ব্রিস্টলের হিউড্রেপার এটি খোদাই করেছিলেন। স্যার উইলিয়াম সেণ্ট

লো এবং লেডিলোর বিরুদ্ধে 'মারণ মন্ত্র' ব্যবহার করার সন্দেহে হিউড্রেপারকে বন্দী করা হয়েছিল এবং প্রাণও গিয়েছিল। অপর একজন, সেও বন্দী হয়েছিল রাণী প্রথম এলিজাবেথকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে। তার নাম মাইকেল মুডী।

আমি প্রশ্ন করি—মাইকেল মুডীকেও কি মন্ত্রসিদ্ধ সন্দেহ করা হয়েছিল?

—না, ওকে ধরা হয়েছিল ষড়যন্ত্রকারী সন্দেহে। তোমাকে একটু আগেই বলছিলাম না, যে ধর্মের নামে কত যে প্রাণ গেছে তার ইতিহাস সম্পূর্ণ করে কেউ লেখেনি। রাজা প্রথম জেমসের সময় গান পাউডার কেস ও ধর্মীয় বিরোধ থেকে সৃষ্ট। ঐ ব্যাপারে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের বন্দী করা হয়েছিল এবং ছিলেন এই 'সল্ট টাওয়ারে'। এর আগে তোমাকে বলেছি স্যার টমাস মোরের কথা, তিনিও ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিলেন বলা যায়।

মিঃ ক্যাসমেন্ট, ধর্মের জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আত্মার নিশ্চয়ই সদ্‌গতি হয় কি বলেন?

—সদ্‌গতি বা অসদ্‌গতি বুঝি না। ধর্মের জন্যেই হক বা অর্থের জন্যেই হক মানুষ দ্বন্দ্বে নামে কেন? নিজের তৃপ্তির জন্যে। সেই তৃপ্তি না পেয়ে যদি কাউকে চলে যেতে হয়, তবে?···আচ্ছা, তোমাকে একটা গল্প বলছি। সল্ট টাওয়ারের বিপরীত দিকে ঐ যে নতুন ব্যারাকের মত বাড়ী দেখছ, ওখানে আমি একদিন বসেছিলাম তখন সন্ধ্যা নেমেছে। হঠাৎ দেখলাম সল্ট টাওয়ার থেকে একজন বেরিয়ে এলো। সাধারণ সাজ পোষাক। খুব সম্ভ্রান্ত বলে মনে হলো না। সে একবার এদিক একবার ওদিক দেখে অতি সন্তর্পণে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভীষণ ভয় পেলাম, কারণ অন্যায়ভাবে আছি। এবার তো লোকটি আমায় ধরে নিয়ে যাবে! তখন বন্ধুর কথা স্মরণ হলো, সে আমাকে কতবার সাবধান করেছে! এখন উপায়!

—কি ভয় পেলে নাকি? আমি কিন্তু তোমাকে ধরতে আসিনি।

আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না কি করব! লোকটি হেসে বললে—ভাবছ নিশ্চয় কি করে বললাম! আমি যে হাত দেখতে জানি। মানুষের মুখ দেখলে কথা বুঝতে পারি। তোমার পাশে বসবো?

ততক্ষণে আমার ভয় চলে গিয়ে একটা কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বললাম বসো না।

সে বসল।

—তুমি কি কর ?

—আমার কালি তৈরী করার ব্যবসা।

—হাত দেখতে শিখলে কি করে ?

—ওটা জন্মগত বলতে পার। আমার মাও পারতেন। আমার দিদিমা খুব ভাল ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন। একবার রাজাকে বলেছিলেন, তোমার রাজ্য কিছু দিনের মধ্যেই আক্রান্ত হবে, কিন্তু তুমি জয়লাভ করবে। তাই হয়েছিল। রাজার তাই বিশ্বাস জন্মে গেল। মাঝে মাঝেই রাজা দিদিমাকে ডেকে পাঠান। একবার তিনি বললেন 'এম' অদ্যক্ষরের কোন মহিলা তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। রাজা ভেবে দেখলেন তাঁর অন্তপুরের সঙ্গিনীদের মধ্যে তিনজনের নামের প্রথম অক্ষর 'এম'। রাজা তাঁদের এড়িয়ে চলেন। রাজার এই ধরনের আচরণে বিস্মিত হয়ে ঐ তিনজন মহিলা খোঁজখবর করতে লাগলেন রাজার উদাসীনতার কারণ সম্বন্ধে। জানতে দেরীও হলো না। তার ফল হলো এই যে আমার দিদিমাকে ডাইনী প্রতিপন্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

—বড়ই দুঃখের বিষয় !

লোকটি বিষণ্ণ হেসে বলল—দুঃখ আর কার জন্যে, আমারও তো একই অবস্থা।

কথাটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম—তার মানে ?

মানে ? একই অপরাধে আমারও কারাদণ্ড

—তোমাকেও ডাইনী সিদ্ধ প্রমাণ করেছে ?

—হ্যাঁ, তাই তো করল।

—এখনও এসবে মানুষ বিশ্বাস করে ?

—ঠিক ব'লতে পারব না এখানকার কথা, তবে আমার ব্যাপার তো আজকের নয়।

—কতদিন আগের ঘটনা ?

—সন তারিখ আমার মনে নেই, যাক ওসব কথা এবার তোমার হাতটা দেখি।

হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাতের দিকে এক পলক চেয়েই বলল—যাঁর খোঁজ এসেছ, তাঁর দেখা পাবে না।

পরীক্ষা করার জন্যে প্রশ্ন করলাম—বলতো যার জন্যে এখানে তার নাম কি ?

সে সহজভাবে বলল—রোজার ক্যাসমেণ্ট।

চমকে তার দিকে তাকাতেই সে হেসে উঠে বলল—ভয় পেলে নাকি? আমি আরও অনেক কথা জানি। তবু সত্যি বলছি আমি ডাইনী সিদ্ধ নই, কিম্বা কারুর ক্ষতি করি না।

এবার আমি সহজ হয়ে বলি—না, না, আমি ভয় পাইনি। তোমার নাম তো বললে না।

—আমার নাম তো সণ্ট টাওয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে,—আমি হিউ ড্রেপার।

কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, হিমেল হাওয়া দিচ্ছিল কি না মনে নেই। তবে আমার মনে হলো হাত পা ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে, আমি বরফ চূড়ায় বসে আছি।

মনের জোরে ভয়ের বাঁধন খুলে যখন পার্শ্ববর্তীর দিকে তাকাতে গেলাম তখন স্থান শূন্য!

এক নিঃশ্বাসে ঘটনাটি ব'লে মিঃ ক্যাসমেণ্ট প্রশ্ন ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম—আপনি ঠিকই বলেছেন আত্মা অবিনশ্বর।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন—ধর্মের কথাই যখন হচ্ছে তখন চল যাই অন্য চ্যাপেলটিতে।

—এটির নাম কি?

—এর নাম দি চ্যাপেল রয়াল অব সেণ্ট পিটার এ্যাড ভিনকুলা, প্রথম হেনরীর সময় চ্যাপলটি তৈরী হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংস্কার করা হয়। এরপর ১৫১২ সালে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ফলে ভজনাগারটির ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। অষ্টম হেনরী সম্পূর্ণ সংস্কার করান।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট যখন চার্চের ইতিহাস বলছিলেন তখন আমি তাকিয়ে দেখছিলাম চার্চের দিকে। পাথরের তৈরী চার্চটির দক্ষিণ ধারে সবুজের সমারোহ। তার নাম 'টাওয়ার গ্রীণ'। শুনলাম অমন যে তৃপ্তিদায়ক সবুজ জমি খণ্ড, ওটি নাকি ছিল কবরস্থান।

চ্যাপেলের সামনে পাথরের চতুষ্কোন গম্বুজ উঠে গেছে উর্দ্ধদিকে। গম্বুজের মাথায় একটি ঘণ্টা ঘর, তাতে একটি বিশাল ঘণ্টা ঝুলছে। মিঃ ক্যাসমেণ্টকে প্রশ্ন করলাম—ঐ ঘণ্টাটা কবেকার?

—ওটা অনেক প্রাচীন, ঠিক কবেকার তা জানা নেই। তবে ১৬৫৯ এটিকে নতুন করে ঢালাই করা হয়েছিল।

—ঘণ্টা বাজে ?

—হ্যাঁ, শিরশ্ছেদ ঘোষণা করার জন্যেই ওটা স্থাপন করা হয়েছিল। যখনই 'টাওয়ার হিল' বা 'টাওয়ার গ্রীণে' কারুর শিরশ্ছেদ হত তখনই ওটি বাজান হতো। চল এবার ভিতরে যাই।

চ্যাপেলের বহিঃঅঙ্গ যতটা, সাধারণ ভিতরটি কিন্তু ততটাই ঐশ্বর্য মণ্ডিত। সুন্দর একটি অরগ্যান রয়েছে, মিঃ ক্যাসমেণ্ট জানালেন এটি লণ্ডনের প্রাচীনতম অরগ্যানের মধ্যে একটি। ১৬৭৯ সালে এটি তৈরী করা হয়। চ্যাপেলে আনা হয়। ১৮৯০ সালে। ১৯৫৮ সনে অরগ্যানটির সংস্কার করানো হলেও এখনও অনেক যন্ত্রপাতিই সে যুগের রয়েছে।

কত মূর্তি, কত মার্বেলের কাজ, সুন্দর সুন্দর কাঁচের জানলা, কাঠের কাজ—সবই অভিভূত হয়ে দেখার মত। লাল আর সবুজ মার্বেলের মেঝে দেখিয়ে বললাম—কি সুন্দর মেঝে !

ম্লান হেসে মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন—সুন্দর বটে, বড় করুণ।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—করুণ কেন ?

—ঐ সুন্দর মেঝের তলায় যে কত মানুষ শেষ নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে তা গোনা নেই।

আমি চমকে উঠে আবার মেঝের দিকে তাকালাম, দেখলাম পাথরের ধারে ধারে হলদে পাথরে লেখা রয়েছে কত নাম। মনের মধ্যে একটু অনুভূতি কেমন শিরশির ক'রে উঠল। আমি কি তবে মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি ? জিজ্ঞাসা করলাম—এর নিচে কি অনেক মৃতদেহ আছে ? এই যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি ?

—সর্বত্র, কোথায় নেই সেটাই বলা কঠিন, শোনা যায় যে যখন চ্যাপালের সংস্কার করা হয়েছিল তখন মাটি কাটতে গিয়ে দেখেছে শুধু হাড়ের স্তূপ। চল এবার টাওয়ার গ্রীন ঘুরে বুচহেম টাওয়ার দেখিয়ে আনি।

বাইরে এসে লোহার বেড়া দেওয়া সবুজ লনের ধারে দাঁড়ালাম। লনের মাঝ বরাবর চতুষ্কোণ একটা জায়গা পাথর দিয়ে বাঁধান, সেটাও লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারও মধ্যস্থলটি আবার চারটি লোহার থাম দিয়ে আলাদা করা, সেটা আবার লোহার চেনে ঘেরা।

মিঃ ক্যাসমেণ্টকে জিজ্ঞেস করলাম—ওখানে কি হয়?

—এখন কিছু হয় না, অতীতে ওটা ছিল বধ্যভূমি। রাণী ভিক্টোরিয়া জায়গাটা বাঁধিয়ে মৃত ব্যক্তিদের নাম লিখিয়ে রেখেছেন।

—এখানেই কি লোকেদের, মানে অপরাধিদের শিরশ্ছেদ করা হতো?

—হ্যা। এখানে মোট সাতজনের গর্দান গিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই প্রায় স্বনাম ধন্য। প্রথমেই নাম করতে হবে অষ্টম হেনরীর প্রিয়তমা স্ত্রী এ্যান বোলিনের। রাজা এই মহিলার প্রেমে অন্ধ হয়ে প্রথমা স্ত্রী ক্যাথোরিনকে অন্যায় ভাবে ত্যাগ করলেন। ত্যাগ বিধি সম্মত না অন্যায় এই দ্বন্দ্বে কতগুলো প্রাণ অসময় চলে গেল। তিনি রাজশক্তিব বলে ত্যাগ করলেন প্রথমাকে। এ্যান-বোলিন এলেন তাঁর পাশে, কিন্তু তাই বা কদিন কাটল শান্তিতে? অষ্টম হেনরী চাইছিলেন পুত্র সন্তান। দিতে পারলেন না এ্যানবোলিন। এ অপরাধের মার্জনা পেলেন না এ্যান। অবশ্য তাঁর দিক থেকেও ত্রুটি ছিল, ঔদ্ধত্য এবং খর জিহ্বা তাঁর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। সব থেকে প্রহসন কি জান? ঐ যে বাড়ীটিব সামনে তোমাকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিলাম, কুইন্স্ হাউস। অষ্টম হেনরীর সঙ্গে চিয়ের আগে থেকেই এ্যান ওখানে রাণীর মত বাস করতে সুরু করেছিলেন। তারপর ঐ 'ট্রেটারসগেট' দিয়ে ঢুকলেন ১৫৩৬ সালে; অপরাধির বেশে। মাত্র ছ' বছরে অবস্থার আমূল পরিবর্তন।

পরিবর্তন অবস্থা হ'লে কি হবে জিভের প্রখরতা বিন্দুমাত্র কমেনি। নেমেই বলেছিলেন—এবার আমায় কোন ভাগাড়ে যেতে হবে শুনি?

স্থানীয় লোকেরা বিনীতভাবে বলেছিল—ভাগাড়ে যাবেন কেন, আপনি থাকবেন প্রাসাদে, অভিষেকের সময় যেখানে ছিলেন।

উঠলেন কুইনস হাউসে, সেই ঘরে যেখানে তিনি মাত্র ছ বছর আগে রাজার সঙ্গে চিত্ত বিনোদন করে বিনিদ্র রাত যাপন করেছেন। এবারও বিনিদ্র রাত কাটালেন…কিন্তু সে বড় কষ্টে, বড় উৎকণ্ঠায়। ঐ প্রাসাদেরই ঘরে তাঁর বিচার হলো, তাতে তাঁকে অবৈধ সংসর্গের অপরাধে দণ্ডিত করা হলো। সে দণ্ড—হয় শিরশ্ছেদ, না হয় অগ্নিদগ্ধ, যেমন রাজার অভিরুচি।

রাজা শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। এ্যান ভয় পেলেন না। গর্বিত-ভাবে জানালেন—আমার শিরশ্ছেদ অন্য সকলের মত কুড়ুল দিয়ে করা চলবে না, তরোয়াল দিয়ে এবং সাধারণ জল্লাদ দিয়ে শিরশ্ছেদ করা চলবে না। তার জন্যে

সেন্ট ওমের থেকে একজন লোক আনা হলো এবং ক্যালিসের তরোয়াল।' তারপর তাঁকে সেন্ট পিটারের ভজনাগারে সমাধিস্থ করা হলো।

এর আগে অবশ্য উইলিয়াম হেস্টিংসের শিরশ্ছেদ হয়েছিল, সেটা ছিল ১৪৮৩ সাল। কিন্তু তিনি চ্যাপেলে স্থান পাননি। এ্যানের পরে ১৫৪১ সালের ২৭শে মে প্ল্যান্টোজেনেট বংশের শেষ কাউন্টেস অব সলস্‌বেরি, মার্গারেট।

মাত্র ছ বছর বাদেই অষ্টম হেনরীর পঞ্চম স্ত্রী-ক্যাথারিন হাওয়ার্ডকেও অ্যানের পথিক হতে হলো। সুন্দরী অষ্টাদশী ক্যাথেরিন বৃদ্ধ রাজার মন জয় করে নিয়েছিল সহজেই। তাকে অদেয় রাজার কিছুই ছিল না, তবু তাকে প্রাণ দিতে হলো, রাজাকে প্রতারণা করবার দায়ে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৫৪২ সালে শিরশ্ছেদ হ'লো ক্যাথেরিনের।

১৩ তারিখটা সত্যই অশুভ, অন্ততঃ ১৫৪২ এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখটা। ঐ দিনই একই জায়গায় আর একজনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তাঁর নাম জেন ভিসকাউন্টেস রচফোর্ড। বলাই বাহুল্য এ বলিদান রাজরোষের ফল। জেন ভিসকাউন্টেস ছিলেন জর্জ ভিসকাণ্ট রচফোর্ডের স্ত্রী। অ্যানের অবৈধ সম্পর্কীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন জর্জ। অ্যানের মৃত্যুর দুদিন আগে টাওয়ার হিলে জর্জের শিরশ্ছেদ হয় এবং শাস্তি হিসাবে অ্যানবোলিনকে সেই দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ-ছাড়াও আরও চার জনের এই ছিন্ন শির হতে হয়েছিল।

এরপর ১৫৫৪ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফুলের মত সুন্দর, জেন গ্রের শিরশ্ছেদ হলো। বেচারার সিংহাসনের প্রতি কোন লোভ ছিল না, অথচ শাস্তি পেতে হলো। মৃত্যুর আগে তাঁকে দেখতে হলো স্বামীর প্রাণদণ্ড। তারই জানলার নিচে দিয়ে স্বামী ডুডলোক টাওয়ার হিলে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর মুণ্ডহীন দেহ আর কাপড় জড়ান ছিন্ন শির নিয়ে যখন সকলে ফিরল, জেন তাও দেখল।

এই জায়গার সপ্তম এবং শেষ বলি রবার্ট ডেভারক্স, এসেক্সের আর্ল। ঘটনা ঘটে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৬০১ সনে। রবার্ট ছিলেন রাণী এলিজাবেথের প্রিয় পাত্র। রাণী তাঁকে একটি আংটি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, যদি প্রয়োজন হয় কোন সাহায্যের, আমার কাছে আংটিটা পাঠিয়ে দিও। রবার্ট ছিল অহংকারী স্বভাবের, কোন কারণে তিনি হঠাৎ রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, ফলে বন্দী হন। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চেয়েছিলেন অঙ্গুরীয়টি রাণীর কাছে;

পাঠাতে। দুঃখের বিষয় সেন্ট আংটি এলিজাবেথের হাতে পৌছবার আগেন তাঁর শির দেহচ্যুত হয়েছিল।

আমি অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম বলিদানের কথা। মিঃ ক্যাসমেন্ট থামতে আমি বললাম—এই জায়গাটায় সাত সাতটা বলি হয়েছে! ভাবলে শরীরে কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

—এখানে তো কম, এর থেকে অনেক বেশী শিরশ্ছেদ হয়েছে 'টাওয়ার হিলে।' টাওয়ার গ্রীণে বেশীর ভাগ মহিলাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাই অনেক বলেন এটা রাণীদের বধ্যভূমি।

—'টাওয়ার হিলে' বুঝি অনেক মানুষ বলি দেওয়া হয়েছিল?

—হ্যা, মানুষ কাটা সুরু হয়েছে সেই ১৩৮৮ সালে স্যার সাইমন বারলের শিরশ্ছেদ দিয়ে। চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময় ১৪৬৫ সালে টাওয়ার হিলে বধ্যভূমি তৈরী করান হয়। এরপর থেকে সুরু হয় শিরশ্ছেদের মিছিল। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেনরীর মন্ত্রী ডুডলে, টমাস মোর এবং নরফোকের ছেলে ফিসার ফিসার—১৫৩৫ সালে, ১৫৪০ সালে টমাস ক্রমওয়েল, ১৫৪৭ সালে সুরি—এই নামটি মনে হ'লে বড় কষ্ট হয়।

—কেন, শিরশ্ছেদ হয়েছিল বলে?

উদাসভাবে মিঃ ক্যাসমেন্ট বললেন না, শিরশ্ছেদতো সবারই হয়েছিল তবে এর প্রতি রাজা এবং পরিষদরা বন নির্মম এবং অপমানজনক ব্যবহাব করেছিলেন।

সুরি কে?

ওর নাম হেনরী, সুরির আর্ল। ঘটনাটাই বলি। অষ্টম হেনরীর ক্ষমতা যত কমতে লাগল রাজসভার সদস্যদের ক্ষমতা লিপ্সা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকল। রাজার একমাত্র পুত্র এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত সুরু হলো। চক্রান্তের ব্যাপারে ধরা পড়লেন নরকোক আর তাঁর কচি পুত্র হেনরী, সুরির আর্ল। তখন নিয়ম ছিল সম্মানিত কোন ব্যক্তিকে টাওয়ারে নিয়ে যেতে গেলে ঢাকা নৌকায় জলপথে নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু সুরিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করাব জন্যে হাঁটিয়ে টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর থাকবার যে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল তার সঙ্গে লাগান ছিল স্নানাগার এবং পয়ঃপ্রণালী। সুরি দেখলেন পয়ঃপ্রণালীটি পাতকুয়ার মত, যার নিচে টেমসের জল রয়েছে। জোয়ারের সময় সেই জল বেশ উঁচু হয়। তিনি মুক্তির পথ খুঁজলেন ঐ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে। টাকা দিয়ে ভৃত্যকে বশ করলেন যে পাতকুয়ার নিচে নৌক নিয়ে মাঝির ব্যবস্থা করবে।

সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হলো। মাঝ রাতে তিনি পয়ঃ প্রণালী দিয়ে জলে লাফিয়েও পড়লেন. কিন্তু নৌকায় ওঠা হলো না, রক্ষীরা তাঁকে শৃঙ্খলিত করে আবার ফিরিয়ে আনল বন্দীশালায়। তারপরই ১৫৪৭ সালে তার শিরশ্ছেদ হলো। এই ঘটনার এক সপ্তাহ বাদে অষ্টম হেনরীর মৃত্যু হয়, সেই সুযোগ, সেবারের মত নরফোক প্রাণে বেঁচে গেলেও টাওয়ার হিল তাঁকে ভোলেনি।

—কেন? আমি প্রশ্ন করি।

—১৫৭২ সালে টাওয়ার হিলে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়েছিল।

—ওখানে কি আরও মানুষের শিরশ্ছেদ হয়েছে?

—আরও অনেক মানুষের ভাগ্যেই এই দুঃখ লেখা ছিল। ১৫৫৩ সালে নরদাম্বার ল্যাণ্ডের ডিউক, ১৫৫৪ সালে, লর্ড গুইফোর্ড ডুডলে, ১৬৪১ সালে স্ট্যাফোর্ড, ১৬৪৫ সালে লাউডের আর্চবিশপ এরপর স্কট দেশীয় লর্ডদের অনেকের শিরশ্ছেদ হয়েছে।

—আপনি যে বলছিলেন বুচহেম টাওয়ারে নিয়ে যাবেন।

—এইবার ওখানে যাব। টাওয়ার গ্রীনের পশ্চিম দিকে এই টাওয়ারটি।

কিছুদূর গিয়ে একটি তিনতলা টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ ক্যাসমেণ্ট বললেন, এই সেই টাওয়ার। বাইরে থেকে বিশেষত্ব কিছুই নেই, তবে এর মধ্যে বন্দীদের করা দেওয়ালের গায়ের খোদাইএর কাজ অপূর্ব। দেখবে নাকি ভিতরে গিয়ে?

—না, আজ আর ইচ্ছা করছে না, যাক, এই পর্যন্ত। বরং আপনি একটা গল্প বলুন।

মিঃ ক্যাসমেণ্ট হেসে উঠে বললেন—সেই ভূতের গল্প? এখন আমারও ইচ্ছা করছে না। যদি সময় পাও তবে আবার এসো, তখন বলব। তুমি চলে যাবার আগে এই টাওয়ারের একটা মজার গল্প বলি শোনো! লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে অনেক দাঁড় কাক আছে। এখানকার লোকের বিশ্বাস দাঁড়কাক যদি না থাকে তবে নাকি টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। সেইজন্য খাদ্য, বাসস্থান দিয়ে রাজার আদরে এখানে দাঁড়কাক পোষা হয়।

চলে আসার আগে মিঃ ক্যাসমেণ্টকে ধন্যবাদ জানাতে উনি বললেন,—ব্রিটেনে যখন এসেছ তখন এখানকার মধ্যযুগীয় প্রাসাদগুলো দেখো, সেগুলো একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে কাহিনী।

—নিশ্চয় দেখবো, যতটা সম্ভব হবে।

চলে এসেছিলাম।

মধ্যযুগীয় প্রাসাদ হ্যামটন কোর্ট দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। হাইড পার্কের কোন থেকে গ্রিন লাইন বাসে উঠে বসলাম। স্থানীয় বন্ধু বান্ধবদের কাছে রোমাঞ্চকর যে সব গল্প শুনেছি তাতে আগ্রহটা অধীর হয়ে উঠেছে। এমন অধরাদের গল্প শুনলে কার না কৌতূহল হয়? দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির থেকে বেরিয়ে আসার এর চেয়ে সহজ পথ আর কী হতে পারে?

বাস তখন লণ্ডনের জমজমাট শহর ছেড়ে গ্রাম্য আমেজের শহরগুলিকে ধরে ফেলেছে। দুধারে সবুজ মাঠ, ক্ষেত দেখতে দেখতে চলেছি। আকাশটা আজ মেঘলা। অবশ্য এমন আবহাওয়া এখানে নতুন নয়। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বাস থামল। জায়গাটির নাম রিচমণ্ড। কনডাকটার জানালেন বাস এখানে দশ মিনিট দাঁড়াবে। নেমে পড়লাম, রাস্তার উল্টো দিকে দেখি হাটের মত বসেছে, গেলাম সেদিকে। সব কিছুই রয়েছে, তবু দেরী হবার ভয়ে কিনলাম না কিছুই।

ফিরে চললাম বাসের দিকে।

হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে। বিচিত্র অনুভূতি! এই অপরিচিত জায়গায় কে আবার আমার পিছু নেবে! মনের দ্বন্দ্বের অবসান করার জন্যে পিছন ফিরে তাকালাম। আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো এক বৃদ্ধার সঙ্গে। তিনি অতি পরিচয়ের হাসি হাসলেন, তারপর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—হাউ আর ইউ?

ভদ্রতা রক্ষা করে বললাম, ফাইন থ্যাঙ্কু, কিন্তু মনের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসছে। ইনি কে? এর আগে কোথাও দেখেছি কি? ইত্যাদি ইত্যাদি····

তিনি মজা পাওয়া মুখ করে বললেন, চিনতে পারলে না তো? কিন্তু আমি তোমাকে চিনি, তুমি ভারতীয় আর এখানে এসেছ হ্যামটন কোর্ট দেখতে!

মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। বিদেশে বিভূঁয়ে এ আবার কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! একে তো বৈদেহীদের নানা আজগুবী কাণ্ড কারখানার কথা শুনে এসেছি। তার প্রভাব যাবে কোথায়? ইনি কি টমাস উলসির কোন সঙ্গিনী, নাকি টিউডর রাণীদের সহচরী? কে?

কল্পনার শাখা প্রশাখা বিস্তার করার আগেই মহিলা খিল খিল করে হেসে উঠলেন—কি ভয় পেলে নাকি? ভয় পাবার কিছু নেই আমি জ্যোতিষও নই;

বা কোন অলৌকিক ক্ষমতাও নেই আমার। যা আছে তা সূক্ষ্ম দৃষ্টি। তোমার হাতে, হ্যামটন কোর্ট প্যালেস বইটা দেখে বুঝলাম তুমি নিশ্চয় ওখানে যাবে। আর সাজ পোষাকে অনুমান করলাম ভারতীয় পর্যটক।

ততক্ষণে বাস হর্ণ দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে, তাই বললাম—খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ হ'যে এখন চলি।

মহিলা বললেন—চল, ঐ গাড়ীতে আমিও যাব হ্যামটন কোর্ট পর্য্যন্ত।

আমার পাশেই বসলেন জমাটি মানুষটি।

বাস চলতে সুরু করল।

মহিলা জানালেন তাঁর নাম, মিসেস এমিলি হাওয়ার্ড। হ্যামটন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

তিনি আমার হাতের বইটার দিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—এটা পড়েছ? তারপর মন্তব্য করলেন, ওতে আছে কি? কোন বইতেই কি প্রাসাদের আসল কথা লেখা থাকে? ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে। রাজাদের কথা, শিল্পের কথা, স্থাপত্যের কথা। কিন্তু এই সব প্রাসাদের পাথরে পাথরে হাসি কান্নার কত কাহিনী লেখা আছে, সেকি কেউ খোঁজ রাখে? প্রাসাদ শুধু দেখার জিনিষ নয়, উপলব্ধির বস্তু। তার জন্যে রাতে এখানে থাকতে হবে!

মনে মনে বললাম, আমার আর উপলব্ধি দরকার নেই। একে তো সাহস করে একা একা এতদূরে এসেছি প্রাসাদ দেখার লোভে। তারপর রাতে থেকে অশরীরীদের কুনজরে পড়ি আর কি!

আমাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি আবার কথা সুরু করলেন, হ্যামটন কোর্টকে অনেকে বলে ভূতুড়ে প্রাসাদ! কিন্তু তার সঙ্গে যে একটা বিরাট ইতিহাস আছে···"

আমি তাঁকে থামিয়ে বলি—মিসেস হাওয়ার্ড, আপনি তো এখানকারই লোক, হ্যামটন কোর্ট প্রাসাদটির সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন না।

মুখ দেখে মনে হলো উনি বেশ খুশী হয়েছেন, বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছ, আমরা এখানকারই লোক। শুধু তাই নয় ইতিহাসখ্যাত কার্ডিনাল উলসি জমিটা খাজনা নেবার আগে থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে বাস করতেন। এই প্রাসাদের গল্প মুখে মুখে চলে আসছে আমাদের বাড়িতে।

উনি ওনার কাহিনী সুরু করেন,—ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সব থেকে ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন কার্ডিনাল উলসি। অষ্টম হেনরির বিশ্বাস ভাজনদের

মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভাগ্য তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল উল্কার বেগে, পৌঁছে দিয়েছিল সৌভাগ্যের শেষ সীমায়। দুঃখের বিষয় তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি সে সৌভাগ্য। উলসির রক্তে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। নিজের বুদ্ধির বলে সমাজের নিম্নস্তর থেকে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উঠেছিলেন। হয়েছিলেন কার্ডিনাল, স্বপ্ন দেখেছিলেন মহামান্য পোপ হবার। কিন্তু চরিতার্থ হয়নি তার বাসনা। সে অবশ্য অন্য কাহিনী।

হ্যামটন কোর্ট নির্মাণ সুরু হয়েছিল দেশ-দেশান্তর থেকে সংগ্রহ করা শিল্প সম্ভার দিয়ে। বিশ্বখ্যাত ভারসাই প্রাসাদের সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্যেই যেন সৃষ্টি করা হলো এই প্রাসাদ। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেমের সেণ্ট জনের কাছ থেকে টেমস নদীর ধারে জমিটি খাজনা নিয়েছিলেন উলসি। এই বিশাল প্রাসাদে অগুনতি ঘর আছে, সে সময় ২৮০টি ঘর সর্বদাই সাজান থাকত। ১৫২৭ সালে একবার এখানে ফরাসী রাজদূত এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল চারশ' সঙ্গী। উলসি তাঁদের সকলকেই হ্যামটন কোর্টে থাকার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। কিন্তু এরপর থেকেই উলসির ভাগ্য বিপর্যয় হ'লো।

এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম, এবার তাঁকে থামতে দেখে প্রশ্ন করলাম— উলসির পতনের কারণ বোধ হয় রাজা অষ্টম হেনরির প্রথম স্ত্রী ক্যাথেরিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে?

—কতকটা তাই। তবে একটা কারণই যথেষ্ট নয়, আরও কারণ আছে। রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যান বোলিনও উলিসকে পছন্দ করতেন না। কারণ কতকটা বংশগত, কতকটা ব্যক্তিগত। সে সময় রাজা অ্যানবোলিনের প্রেমে মগ্ন। তাই তাঁর বিরাগভাজন ব্যক্তিকে হেনরি সহ্য করতে পারছিলেন না। সর্বোপরি বলব উলসির পতনের কারণ রাজার প্রকৃতি। তিনি যখন যাঁকে পছন্দ করতেন, তখন তাঁকে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতেন এবং নির্ভর করতেন। যে মুহূর্তে তাঁর সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগত, সমস্ত প্রেম, ভালবাস সে মুহূর্তেই কর্পূরের মত উবে যেত। তিনি একবার তলিয়ে দেখার চেষ্টাও করতেন না বা সত্যাসত্য যাচাইও করতেন না। উলসি ক্যাথেরিনের সঙ্গে রাজার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে চেষ্টা করছিলেন, রাজা ভেবেছিলেন উলসি ইচ্ছা করলেই ঘটনাটি দ্রুত ঘটাতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে উলসিকে এমন সব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলো যে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। রাজা ভাবলেন উলসি ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাকে

বাধা দিচ্ছেন। হেনরির বিরূপ মনভাবে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন অ্যানবোলিন। তিক্ততা জমতে লাগল, রাজরোষ বাড়তে থাকল।

রাজার মন ফিরে পাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন উলসি। নিজের 'মানস' প্রাসাদ 'হ্যামটন কোর্ট' তুলে দিলেন হেনরির হাতে। ১৫২৯ সালের ৩রা জুলাই তিনি হ্যামটন কোর্ট ছেড়ে দিলেন। ঐ বছরই জমি সমেত প্রাসাদটি বাজেয়াপ্ত হলো, এমনকি অন্যান্য সম্পত্তিও। সাময়িক ভাবে উলসিকে মুক্তি দেওয়া হলেও নভেম্বর মাসে দেশের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সুকৃতি একটু ছিল তাই পথেই মৃত্যু এসে তাঁকে বিচারের প্রহসনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল।

কার্ডিনাল উলসির কথা শেষ করে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

তাঁকে নীরব দেখে আমিই প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, আপনি যে তখন বলছিলেন প্রাসাদটিকে অনেকে বলে ভূতুড়ে, আপনি কি কখনও কিছু দেখেছেন?

মিসেস হাওয়ার্ড মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলেন—আমি কিছু দেখিনি বটে, তবে আমার ঠাকুরদা দেখেছেন, আমার মাও শুনেছেন।

তাঁর কথা শুনে আমার মনের কৌতূহলগুলো অল্প জলে জিওল মাছের মত ছটফট করতে থাকে, তাই প্রশ্ন করি—কি দেখেছিলেন?

—সেও এক ইতিহাস।

—বলুন না শুনি।

—অষ্টম হেনরির পর প্রাসাদে অনেক রাজা রাণী এসেছেন, মারা গেছেন। ১৭৬০ সালে দ্বিতীয় জর্জের পর আর কোন রাজা ঐ প্রাসাদে স্থায়ী বাসিন্দা হননি। হয়তো কখনও বেড়াতে বা শিকারে এসে কয়েক দিন কাটিয়ে গেছেন। রাণী ভিক্টোরিয়া ঠিক করলেন এই প্রাসাদের দু একটি অংশ সাধারণের জন্যে খুলে দেবেন, যাতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সেখানে সভা বসতে পারে বা অন্য কোন কাজে লাগে। প্রাসাদটি ঐভাবে সাধারণের জন্য খুলে দিতে গেলে কিছু সংস্কারের কাজ থাকে, কিছু জিনিষপত্র হিসাব রাখার কাজ থাকে। এই কাজের জন্য যে সব লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমার ঠাকুরদাও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম হলগেট।

ঐ সময় তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল হ্যামটন কোর্টের দোতলার ঘরে। মিঃ হলগেটের পাশের ঘরটিই ছিল প্রার্থনাগার। রাত্রে শোবার পর তাঁর একটা

অনুভূতি হত যা তিনি কাউকে বোঝাতে পারতেন না। মনে হতো ঘরে কেউ ঢুকছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ উঠে দেখতেন দরজা যেমন কে তেমন বন্ধ। এইভাবে দুরাত কেটে গেল। তৃতীয় রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানার মধ্যে উঠে বসে শুনতে চেষ্টা করলেন আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে, মনে হলো গীর্জার দিক থেকে। উঠে তাড়াতাড়ি গীর্জার সামনের বারান্দায় এলেন, দেখলেন এক সুন্দরী তরুণীকে দু তিন জন লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে পরিত্রাণ পাবার জন্যে চিৎকার করছে। উইলিয়ামের তখন বয়স কম, সামনে দিয়ে ঐভাবে একজন মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি দৌড়ে গেলেন মেয়েটিকে রক্ষা করার জন্য, হঠাৎ পায়ে কি একটা আটকে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে কারা যেন হেসে ওঠে। প্রায় শূন্য প্রাসাদে এত লোক কোথা থেকে এলো! আশ্চর্য!

তিনি উঠে পড়ে এগিয়ে গেলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পড়ে গিয়ে উঠতে আর কতটুকু সময়? পড়ার আগে দেখে ছিলেন বারান্দার ডান দিকে তারা বাঁক নিচ্ছে। এর মধ্যে এতগুলো প্রাণী গেলই বা কোথায়? তাঁর হঠাৎ ভয় ভয় করতে লাগল।

—ভূতের ভয় বুঝি? আমি প্রশ্ন করলাম।

—না, তা নয়। উইলিয়ামের মনে হলো, পোড়ো প্রাসাদে হয়তো কিছু দুষ্টু লোক আছে, তারাই তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য বা বিপদে ফেলার জন্য এইসব করছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হলো তিনি তাড়াহুড়োতে সঙ্গে কোন অস্ত্রও আনেন নি। যদি এখন তাঁকে কেউ আক্রমণ করে তবে বেঘরেই প্রাণহারাতে হবে।

আর দাঁড়ালেন না, ঘরে ফিরে এলেন। তিনি জানতেন না, সেখানে আর এক বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দরজা বন্ধ করে পিছন ফিরতেই দেখলেন ঘরের দেরাজ খুলে এক মহিলা এক মনে কি যেন খুঁজছিল। ঘরে রাতের আলো জ্বলছিল, স্পষ্ট ভাবে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল মহিলা সম্ভ্রান্ত ঘরের। কিন্তু তাঁর ঘরে কেন? কি করবেন বুঝতে পারলেন না। মহিলাকে সচেতন করার জন্য গলায় দুবার আওয়াজ করলেন। কোন ফল হলো না। মহা মুস্কিল! ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন কাছে যাওয়াই ভাল, পায়ের শব্দে যদি চেয়ে দেখে।

লাভ হলো না। এবার তিনি গলা তুলে ডাকলেন—মহাশয়া আপনি কে?

বিন্দুমাত্র ফল হলো না। মহিলা কি কানে কম শোনেন? উইলিয়াম এবার যেদিকে মহিলার মুখ সেদিকে গিয়ে ডাকলেন।

এবার কাজ হলো। মহিলা মুখ তুলে চাইলেন। মাঝ বয়সী এক মহিলা, তবে সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত।

উইলিয়াম দেখলেন দৃষ্টির মধ্যে একটা ব্যাকুল ভাব। তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন।

আস্তে আস্তে বললেন—আমার একটা পুরানো নথি হারিয়ে গেছে, তাই খুঁজছিলাম।

উইলিয়াম বুঝলেন, এই প্রাসাদের রদ বদল হবার খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে খুঁজে দেখছে যদি মূল্যবান কিছু পায়। এখন ধরা পড়ে ঐ কথা বলছে।

মুখে বললেন—মাঝ রাতে কি কেউ নথি পত্র খোঁজে? তাও একজনের শোবার ঘরে?

কথাটি প্রায় লুফে নিয়ে বলে—এটাই যে আমার স্বামীর কাগজপত্র রাখার ঘর ছিল। আর তিনিই যে বললেন এখানে আছে।

—ভাল কথা, কিন্তু আপনার স্বামীকে আমি জানি না। তিনি যেই হন না কেন, তাঁর এই সময় আপনাকে পাঠান মোটেই উচিত হয়নি। নিশ্চয় জানেন এ সময় আমি এখানে আছি।

মহিলা কুণ্ঠিত ভাবে বলে—বোধ হয় জানে না, কিম্বা জানলেও মনে নেই। সে যা দুশ্চিন্তা নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল।

—আপনার পরিচয় তো দিলেন না।

—পরিচয় পত্রই তো খুঁজছিলাম, সেটা না হলে তো আমার সেই এক পরিচয় উপপত্নী।

—নাম কি আপনার?

—মার্গারেট উডভিল।

—বাড়ী কোথায়?

—এখন নেই, আগে ছিল, এখান থেকে অল্প দূরে। ছোট্ট গ্রাম। সামনে দিয়ে টেমস নদী ব'য়ে যেত। সেখানে মাঝে মাঝে আসত টমাস। ওখানে চার্চে একজন ধর্মযাজক ছিলেন, তিনি টমাসকে খুব ভালবাসতেন। তার

বাবা মাংস বিক্রি করত বলে অনেকে ঠাট্টা করত, কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী তাকে ভাল-বাসতেন কারণ সে ছিল ভীষণ মেধাবী।

মাঝখানে উইলিয়াম প্রশ্ন করেন—টমাস এখন কি করছে?

—কিছুই না।

—অত মেধাবী ছেলে আর কিছু করতে পারল না।

মহিলা বেশ বিরক্ত হয়ে বলেন—কিছু শুনলে না আর কথা বলছ, আগে শোনো।

—বলুন শুনছি।

—টমাস ছোট থেকে বড হবার, অনেক অনেক বড হবার স্বপ্ন দেখে। সামান্য মাংসওয়ালার ছেলে সুযোগ পায়না পড়াশোনার। কিন্তু সে হারেনি, চার্চে গিয়ে গিয়ে, বিশপদের সহানুভূতি নিয়ে পড়াশুনো করল। মাত্র পনের বছর বয়সে বি. এ পরীক্ষা পাশ করল অক্সফোর্ড থেকে। বুঝেছিল যে উঠতে হলে তাকে চার্চের সাহায্য নিতে হবে, না, হলেই শুনতে হবে 'মাংসওলার ছেলে।' উঠেও ছিল। রাজার অনুগ্রও পেয়েছিল, কিন্তু

—কি কিন্তু?

—কিছুই ভোগে লাগল না।

—কেন?

—রাজরোষ! নিয়ে নিল সব।

—আপনার সঙ্গে সম্পর্ক? নিশ্চয় স্বামী!

—স্বামী অবশ্যই তবে লোক জানিয়ে হয়নি, তাই লোকে বলে উপপত্নী। আরও বলে ওর তো অনেক উপপত্নী আছে তাদের মধ্যে তুমিও একজন। তাই তো সেই প্রমাণ পত্রটা খুঁজছি যাতে টমাস আমাকে লিখেছে, লোকে যে যাই বলুক তুমি আমার স্ত্রী, তোমার সন্তানরাই হবে আমার উত্তরাধিকারী।

—টমাস এখন কোথায়?

—এখানেই কোথাও আছে, এবাড়ীর মায়া তো কাটাতে পারেনি। বড় আশা নিয়ে, বড় শখ করে তৈরী করেছিল।

—টমাস এখানে কি করতেন?

—কি করবে? এটা তো তারই বাড়ী!

উইলিয়াম বুঝলেন এই মাঝ রাতে তিনি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন, না হলে রাজপ্রাসাদকে কেউ বলে তার বাড়ী। নির্ঘাত পাগল।

মনের ভাব প্রকাশ না করে সহজভাবেই বললেন—এতো রাজবাড়ী, একি কখনও সাধারণ লোকেব····

—সাধারণ লোক! সে কি তুমি, কার্ডিনাল উলসিকে চেন না? এ বাড়ী তাবই তো করা····

আমার ঠাকুরদা আর কিছু শুনতে পাননি যখন জ্ঞান হয়েছে তখন দেখেছেন তাঁব সহকর্মীবা তাঁকে ঘিবে বয়েছে। পবে সুস্থ হয়ে তিনি সব ঘটনা বলেছিলেন। শুনে তাঁরা বলেছেন, এখানে প্রায়ই নানান ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে ঐ যে বারান্দাতে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন, ওখানে প্রায়ই অশরীরীদেব আনাগোনা চলতে থাকে।

এতক্ষণ আমি বৃদ্ধার কথা এক মনে শুনছিলাম। ভূতুড়ে বারান্দার কথা শুনে আমাব কৌতুহল হলো। প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, আপনি যে ভূতুড়ে বারান্দার কথা বললেন, সেখানে কি হয়? আব ঐ বারান্দাতেই বা কেন?

—যদি বল যে একটিমাত্র বারান্দা, তবে কিন্তু ভুল হবে, কোথাও বেশী কোথাও কম, কিন্তু সর্বত্রব্যাপী। বারান্দাটায় কেন বেশী জান? বাঁচার আকুতিই এর মূল কারণ।

—সেটা কি?

—অষ্টম হেনরির কথা তো তুমি জান, প্রথম স্ত্রীকে জোর করে সরালেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর শিরশ্ছেদ হলো, তৃতীয় বৌ বাঁচলেন না বেশীদিন, চতুর্থ স্ত্রীকে পছন্দ হলো না, পঞ্চমবার নেহাৎই বৃদ্ধ বয়সে অষ্টদশীকে বিয়ে করলেন। লাস্যময়ী ক্যাথেরিন ভাবলেন রাণী তো হব, তারপর নিজের আনন্দ অন্য স্থান থেকে আহরণ করলেই হবে। চলছিল বেশ। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' নিয়ে রাজাও যেন নবজীবন পেলেন। কিন্তু সুখ যে পদ্ম পাতার জল। স্থায়ী হলো না। হিংসুকরা ক্যাথেরিনের সুখ সহ্য করতে পারল না। রাজার কান ভারি করতে লাগল। রাজা তাঁর সাধের ক্যাথেরিনের কোন নিন্দা শুনতে রাজি নন। নিন্দুকরা নাছোড়বান্দা। হাতে নাতে ধরিয়ে দিলেন তাঁরা। হেনরির 'কাঁচের স্বর্গ' ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। এত ভালবাসার এই পরিণতি। রাজা মোহগ্রস্থ হয়েছেন অনেকবার, কিন্তু এমন মন উজাড় করে ভালোবাসেননি কাউকে।

শাস্তি দিলেন রাজা—শিরশ্ছেদ।

ক্যাথেরিন বিদায় নিল না। রাজার ভালবাসার গভীরতা মাপতে তাব

ভুল হয়নি। সে জানতো যদি একবার রাজার সামনে যেতে পারে তবে রাজার ক্ষমা সে পাবেই। কিন্তু যাবে কি করে, সে যে তখন বন্দিনী। তবু আশা ছাড়েনি ক্যাথেরিন। একদিন এক ফাঁকে প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে হাজির হয়েছিল প্রার্থনা ঘরের সামনে। সে জানত ঐ সময় রাজ প্রার্থনা করেন।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে যাবে, ঠিক তখনই প্রহরীরা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। সে যাবে না, তারাও ছাড়বে না। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল রক্ষীরা আর ক্যাথেরিন আর্ত চিৎকার করছিল—রাজা আমাকে বাঁচাও, স্বামী তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর কোনদিন আমি বিশ্বাসঘাতিনী হব না।

বন্ধ দরজা পেরিয়ে সে শব্দ বৃদ্ধ রাজার কানে পৌঁছায়নি। কিন্তু আজও গভীর রাতে মাঝে মাঝে অলিন্দে শোনা যায় আর্ত চিৎকার। তারপর ক্যাথেরিনের শিরশ্ছেদ হয়েছিল।

—জানি, টাওয়ার অব লণ্ডনে।

—হ্যাঁ, একই জায়গায়, যেখানে এ্যানবোলিনের শিরশ্ছেদ হয়েছিল।

—তারপর ?

—এরপর অষ্টম হেনরি আর বেশী দিন হ্যামটন কোর্টে থাকেননি। চলে এসেছিলেন লণ্ডনে, বাস করেছিলেন বাকিংহাম প্রাসাদে।

অষ্টম হেনরি যতদিন এখানে ছিলেন ততদিন এখানকার অনেক উন্নতি করেছেন। যখন হ্যামটন কোর্ট রাজার হাতে এলো তখন তিনি এ্যানবোলিনের প্রেমে অন্ধ। প্রাসাদে একটি বিশাল ঘর করালেন যার দৈর্ঘ ১০৬ ফিট, প্রস্থ ৪০ ফিট, আর উচ্চতা ৬০ ফিট। শুধু বিশালতাই নয়, ঘরটি সাজিয়ে ছিলেন দুষ্প্রাপ্য সব জিনিষ দিয়ে। প্রধান ফটকের নাম রেখেছিলেন এ্যানবোলিনস গেট। দুঃখের বিষয় এই যে কিছুই তিনি ভোগ করতে পারলেন না। স্থাপত্য বা সাজ সজ্জার কাজ শেষ হবার আগেই তার শিরচ্ছেদ হয়ে গেল।

বৃদ্ধাকে থামতে দেখে প্রশ্ন করলাম—রাজা অষ্টম হেনরি অ্যানের সময় থেকে ক্যাথেরিনের সময় পর্য্যন্ত তো এখানেই ছিলেন ?

—হ্যাঁ, বেশীর ভাগ এখানেই থাকতেন। তৃতীয়া স্ত্রী জেন সাইমোর তো বিয়ের আগে থেকেই এখানে ছিলেন। রাজার পূর্বরাগ, বিয়ে, সবই এখানে। রাজার জীবনের সব থেকে বড় সাধ—পুরুষ উত্তরাধিকারী, তা শুধু জেনই দিয়েছিলেন। কিন্তু সুখ ভোগ করতে পারলেন না, ছেলের জন্ম দেবার মাত্র কদিন

পরেই ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেলেন। অবশ্য একদিকে তাঁকে ভাগ্যবতী বলব কারণ তিনিই একমাত্র, যাঁর সমাধি রাজার পাশে হয়েছে।

—আচ্ছা আপনি যে বলছিলেন আপনার মা দেখেছেন এখানকার অশরীরীদের।

—সে অনেকদিন আগের কথা, তখন পঞ্চম জর্জের সময়। আমার বাবা এই প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে এলেন। মার ইতিহাসের ওপর খুব ঝোঁক ছিল। আসতেন মাঝে মাঝে। একদিন বিকেলে এসেছিলেন, এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আর বৃষ্টিও এলো চেপে। ভাবলেন জল কমলে চলে যাবেন। কিন্তু জল আর কমল না। বাবা তখনও নিচের ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব মেলাচ্ছিলেন। মার ঘুরে ঘুবে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, ভাবলেন, কেউ তো নেই, এই ফাঁকে একটু রাজাদের বিছানায় বসে নেবেন। তিনি যেই বসতে যাবেন, অমনি এক নারী কণ্ঠ বলে উঠল,—না, না, বসো না।

মা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে গেলেন কে কথা বলল। দেখেন সামনেই সাদা পোষাক পরা এক মহিলা। মুখটা যেন চেনা চেনা।

মা তাকাতেই, মহিলা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন—দেখছ না বাচ্চা ঘুমাচ্ছে, তুমি বসলে ও উঠে পড়বে না?

অপ্রতিভ হয়ে মা বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কিছু নেই। ফিরে মহিলাকে বলতে যাবেন, দেখলেন তিনি সেখান থেকে সরে গেছেন। এমন সময় শুনলেন ঘুমপাড়ানি গান। শব্দ অনুসরণ করে ঘুরে দাঁড়াতে দেখলেন সেই মহিলা একটি শিশুকে বুকে নিয়ে আদর করছে। মা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন—আপনি কে? এখানে এখন কি করছেন ইত্যাদি। কিন্তু মাকে কথার সুযোগ না দিয়ে বলে—চুপ, এডওয়ার্ড উঠে পড়বে।

মা তাও প্রশ্ন করেন—তুমি কে?

সে খিল খিল করে হেসে বলে—আমি, জেন সাইমোর। এই তো আমার আদরের ছেলে এডওয়ার্ড।

এই কথা শুনে মা তর তর করে ছুটে চলে এসেছিলেন বাবার কাছে। আর কোনদিন রাতে বা সন্ধ্যায় ওখানে যেতেন না।

আমি এবার প্রশ্ন করি—অষ্টম হেনরির পর আর কে কে এখানে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন?

—হেনরির পর যাঁরা এখানে ছিলেন তাঁরা হলেন—প্রথম এবং দ্বিতীয়

চার্লস, উইলিয়াম, মেরি, অ্যান, তারপর প্রথম এবং দ্বিতীয় জর্জ। এঁদের মধ্যে আবার দ্বিতীয় চার্লস, মেরি এবং উইলিয়ামই হামটনকোর্টের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক সংযোজন, বিয়োজন করেছিলেন।

কাহিনী শুনতে শুনতে মিসেস হাওয়ার্ডের গন্তব্যস্থান এসে পড়ল। তিনি নামার আগে বললেন—তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় ভাল লাগল, হাতে সময় থাকলে আমি নিজে তোমার সঙ্গে গিয়ে প্রাসাদের কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিতাম। দুঃখের বিষয় আমার হাতে একেবারে সময় নেই।

—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

আমার কথা মাঝ পথে থমিয়ে দিয়ে বললেন—এতে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। তুমি শুনতে ভালবাস আর আমি বলতে ভালবাসি।

—আপনি এমন সুন্দর করে বলেছেন মনে হয় যেন আমি তা চোখে দেখতে পাচ্ছি।

—অনেক জানার বাকি।

তারপর একটু কি ভেবে নিজের ব্যাগ খুলে একটুকরো কাগজ বার করে তাতে একটা নাম লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এতে যাঁর নাম লেখা আছে, তিনি অনেক কিছু জানেন, তাঁকে আমার নাম করো তা হলেই হবে।

—কোথায় থাকেন তিনি।

—ঐ প্রাসাদে এখন যে অফিস হয়েছে, সেখানেই।

বাস থামতে তিনি বিদায় জানিয়ে নেমে গেলেন। আমি হাতে ধরা হ্যামটন কোন বইটাতে মননিবেশ করলাম। অবশ্য বেশীক্ষণের জন্য নয়, একটু পরেই আমার নামার সময় এসে গেল।

বাস থেকে নামতে নামতেই দেখতে পেলাম বিশাল প্রাসাদ তার গাম্ভীর্য আর ঐতিহ্য নিয়ে অহংকারীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদে ঢুকতে টিকিট করতে হয়। ব্রোঞ্জের মূর্তির পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে প্রাসাদের দিকে। ফটক পেরিয়ে পড়লাম বিশাল উঠানে, ডান ধারে কয়েক ধাপ উঠলে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় প্রশস্ত জায়গা, অফিস মত। খাতা নিয়ে টেবিলে বসে থাকা এক ভদ্রলোককে মিসেস হাওয়ার্ডের লেখা কাগজটি দেখাতে, তিনি বললেন—বাঁদিকের ঘরে যান ওখানেই মিঃ ডেলডার ফিল্ড আছেন। গেলাম! সেখানে তিনজন লোক তিনটি টেবিলে বসে কাজ করছিলেন।

সামনের ভদ্রলোকের টেবিলের কাছে যেতে তিনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—আমি কি চাই। বললাম। ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

মিঃ ডেলডার ফিল্ড মানুষটি খুবই অমায়িক। আমাকে বসতে বললেন। হাতের কাজ গোছাতে গোছাতে তিনি কথা শুরু করলেন—আমি অবশ্য প্রথম এখানকার গাইড হয়েই কাকার সঙ্গে এসেছিলাম, তারপর অন্য কাজে চলে এসেছি, চল তোমাকে দেখাব। কোন দূর দেশ থেকে এসেছ, কত কৌতূহল নিয়ে, তোমাকে দেখাতে আমারও ভালই লাগবে।

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে আবার উঠানে নেমে ডানদিকে এগিয়ে গেলেন। সামনে গম্বুজওয়ালা আর একটি বিশাল ফটক। খিলানের সামনে এসে মিঃ ডেলডার ফিল্ড থামলেন বললে—উপরে তাকাও।

তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বিশাল একটি ঘড়ি রয়েছে সেখানে।

—ওটা এ্যাসট্রোনমিকাল ক্লক।

—মানে ওতে জ্যোতিষের ব্যাপার আছে নাকি কিছু? প্রশ্ন করলাম।

—'জ্যোতিষ' অর্থে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বোঝায় বলে ঐ রকম নাম। ওতে বোঝা যায় সময়, বার, মাস, সেই দিনটি বছরের কততম দিন, চন্দ্রের অবস্থান, গ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটা, ইত্যাদি সব কিছুই জানা যায়।

—ঘড়িটি তো দেখছি বিশাল।

—তিনটি বেড় দেওয়া ডায়েল রয়েছে, ওর সব থেকে বড়টির ব্যাস ৭ ফিট ১০ ইঞ্চি, আর শেষে যে পাড়ের মত দেখছ ওটির বেড ৯ ফিট, ৮ ইঞ্চি।

—ঘড়িটি কতদিনের পুরানো?

—তা অনেক দিন হলো। রাজা অষ্টম হেনরির সময় ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। তখন থেকে ভালভাবেই চলছিল, ১৮৭০ সালে এর কলকব্জা নষ্ট হয়ে যায়। তখন যন্ত্রপাতি বদলে ভাল করে সারান হয়, সেই থেকে ভালভাবেই চলছে। তবে এই সঙ্গে একটা অলৌকিক বিশ্বাস জড়িয়ে আছে, সেটা না বললে ঘটনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই প্রাসাদে অবস্থানকারী রাজ পরিবার ভুক্ত কেউ মারা গেলেই নাকি ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম বন্ধ হ'য়ে যায় ১৬১৯ সালে ২রা মার্চ। সেদিন ডেনমার্কের এ্যানের মৃত্যু হয়েছিল, এমন কি যে মুহূর্তে এ্যানের প্রাণ বেরিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘড়িটি থেমে গিয়েছিল।

আশ্চর্য!

—সত্যিই এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এসো, আরও নানা ঘটনার কথা বলব।

আমরা ফটক পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন—ঐ যে ফটকটি দেখলে ওর নাম এ্যানবোলিন গেট।

—এ্যানবোলিন কি এদিকে থাকতেন ?

—না, ওপরে রাণীদের ঘর আছে সেখানেই থাকতেন। এই ফটকটির নাম দিয়েছিলেন রাজা তাঁর প্রিয় স্ত্রীর নাম স্মরণীয় করার জন্য। দুঃখের বিষয় এই যে, অবশ্যই স্মরণীয় হলো কিন্তু তাঁর মন থেকে অ্যানের নাম মুছে গেল।

উঠান পেরিয়ে এবার আমরা উঠলাম কয়েক ধাপ সেখানে বেশ প্রশস্থ জায়গা, তারপরই উপরে ওঠার সিঁড়ি। পেন্টিং, কার্পেট, ঝাড় আর ছবি দিয়ে চারিধার সাজান।

মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন এই সিঁড়ির নাম "রাজার সিঁড়ি।"

আমি অবাক বিস্ময়ে ঐ সব শিল্প দেখতে দেখতে বললাম—সার্থক নাম! এ সিঁড়িতে যেন আমাদের মানায় না। জমকাল পোষাক পরে সপরিষদ থাকলে তবে এ সিঁড়িকে মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভদ্রলোক বললেন—রাজাদের মানায় বললে সে কথাতেই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। জানি না তুমি বিশ্বাস করবে কি না, কারণ এসব ধারণা, সত্যি নাও হতে পারে।

আমি মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েই বলি—মিঃ ডলডার ফিল্ড বিশ্বাস করুণ আমি এ সব শুনতে ভীষণ ভালবাসি। এই তো একটু আগে মিসেস হাওয়ার্ডের মুখে এখানকার কত ঘটনা শুনলাম। তখন তো প্রাসাদটা দেখাইনি। এখন দেখছি. তাই কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—চল উপরে উঠে কোথাও বসে কাহিনী বলব।

উঠে এসে তন্ময় হয়ে পেন্টিং দেখতে লাগলাম, ভুলে গেলাম কাহিনীর কথা। ছবির উপজীব্য রোমান কাহিনী আর গ্রীক দেবতা। কী বীরত্ব ব্যাঞ্জক চেহারা। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—অপূর্ব!

—সত্যিই অপূর্ব! আরও আছে।

আমি মিনতি করে বললাম—আমায় আর একটু সময় থাকতে দিন. দেখে আশা মিটছে না।

তিনি হেসে বললেন—দেখ, দেখ, যতক্ষণ খুশী, আমি তো তোমাকে একবারও তাড়া দিইনি।

—আচ্ছা মিঃ ডেলডার ফিল্ড, এ ছবির শিল্পী কে ?

—এ্যান্টোনিও ভেরিও। ইতালী দেশের শিল্পী।

—অষ্টম হেনরি আনিয়েছিলেন বুঝি ?

—না, না, ভেরিও অনেক পরের যুগের মানুষ : দ্বিতীয় চার্লস তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে আমন্ত্রণ করে আনেন উইণ্ডসার ক্যাসেলে আঁকার জন্য। উনি ইংলণ্ডে আসেন ১৬৭৫ সালে। তার আগে তিনি ইতালীতে আর ফ্রান্সে প্রচুর আঁকার কাজ করেছিলেন।

—ইনি ইতালীয় বলে দেখছি ছবির চরিত্রগুলি ঐ দেশীয়।

মিঃ ডেলডার ফিল্ড হেসে বললেন—কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, তবে ভেরিওর আঁকার একটা বিশেষত্ব বা মজা আছে।

—সেটা কি ?

—সেটা হচ্ছে তিনি যখন দেবতাদের আঁকতেন তখন অনেক সময় তাঁদের মুখটি নিজের মত অথবা নিজের প্রিয় পাত্রদের মুখ আঁকতেন। আবার যাঁদের পছন্দ করতেন না, তাঁদের সাধারণতঃ ডাইনী বা অপদেবতা হিসাবে আঁকতেন। যেমন এখানে রোমান পৌরাণিক কাহিনীর ডাইনীর মত কুটিল চরিত্র এ্যাট্রোপসের। ভেরিও তার ছবি আঁকার সময় মুখটি করলেন মিসেস হ্যাকেটের। এই মহিলাটি ছিলেন তখন হ্যামটকোর্টের গৃহ পরিচারিকা। মিসেস হ্যাকেট প্রায় তাঁর শত্রুর মত ছিলেন।

—বেশ মজার কথা তো! অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিল্পীর প্রিয় মানুষের মুখ বারে বারে তার শিল্পে ছায়াপাত করছে।

—এখানের ঘটনাও তাই, তবে নথিপত্র বা অন্যত্র থেকে যেটুকু জানা যায়, তাতে মনে হয় তিনি ভালবাসা বা প্রতিশোধ নিতেন শিল্পের মাধ্যমে। বেটি প্রিক্ নামে এক সুন্দরী পরিচারিকা ছিল। ভেরিওর তাঁকে ভাল লাগে কিন্তু তাঁর সেই ভাললাগার মধ্যে কামের প্রাধান্যের জন্য বেটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তাঁর সম্বন্ধে ভীতিপ্রদ ছবি আঁকলেন। এই রকম বহু ঘটনা আছে।

—বলুন না, আর কয়েকটা।

—আমি বলতে পারি, কিন্তু তোমার দেরী হ'য়ে যাবে না তো ? তুমি তো ফিরবে।

—না, দেরী হবে না, আপনি বলুন।

—বলছি, ১৬৬৫-১৭০৭ সাল পর্য্যন্ত এ্যান ম্যারিওট নামে একটি সুন্দরী মেয়ে হ্যামটন কোর্টে বাস করত। তার বাবা এখানেই কাজ করত। মেয়েটির বয়স তখন ২১ বছর। সে সময় ভেরিও রাজার সিঁড়িতে 'মুরলা' করছিলেন। এ্যানের রূপে মুগ্ধ হলেও তিনি বেট্রির মতই প্রত্যাখ্যাত হলেন। অবশ্য হ্যামটনের কোথাও ভয়াবহ মূর্তি নেই। রাজার সিঁড়িতে তাঁর আঁকা ছবির কয়েকটিতে মুখ প্রতিফলিত হয়েছে। চল এবার অন্য ঘরে যাই।

—আপনি যে গল্প বলবেন বলেছিলেন।

—বলব আগে রাজার শয়ন কক্ষটি দেখে আসি।

আমরা বিশাল একটি ঘরে ঢুকলাম। সোনাব জলে লেখা রয়েছে 'কিংস গার্ডরুম'। রাজারা যখন হ্যামটন কোর্টে থাকতেন তখন প্রহরীরা এখান থেকে পাহারা দিত। নাম পড়েই ঢুকলাম এটি পাহারা দেবার ঘর, বুঝেছিলাম অস্ত্রশস্ত্র থাকবে। কিন্তু এক সঙ্গে এত এবং শিল্প সম্মতভাবে সাজান হয়েছে, যে মনে হয়-এক হস্তাঙ্কন শিল্পের প্রদর্শনী।

মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলাম,—এমন সুন্দর ক'রে কে সাজাল।

—তৃতীয় উইলিয়ামের সময় অস্ত্র রক্ষক ছিলেন হ্যারিস, তিনি তিন হাজারেরও বেশী অস্ত্র দিয়ে এটি সাজিয়েছেন।

ঘরের ডানদিকে একটি ছোট দরজা দেখিয়ে আমি জিজ্ঞাস করলাম—এই দরজাটি কোথায় গেছে?

—উলসির ঘরে। চল ওটাই আগে দেখব।

আনুপাতিক ভাবে ঘরটি ছোট। পরিচ্ছন্ন কাঠের দেওয়াল, উপর দিকে পেন্টিং, ছাতেও রঙিন কাজ। বললাম—এতক্ষণ যা দেখলাম সে তুলনায় এর জাঁকজমক অনেক কম। অবশ্য তিনি তো আসলে ধর্মীয় ব্যাপারে জড়িত ছিলেন।

—এই ঘরটির নাম যদিও উলসির ঘর, তবে এখানে উলসি থাকতেন না।

—তবে এখানে কে থাকত?

—উলসির বিশেষ অতিথিরা। অতিথিদের জন্য এ ছাড়াও আরও ঘর ছিল।

—হ্যা, শুনেছি এখানে পাঁচশ' ঘর আছে।

তিনি কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—এখানে ৫০০ ঘর না হাজারেরও বেশী ঘর

আছে। উলসি ব্যবহার করতেন ৫০০ ঘর তার মধ্যে ২৮০টি মখমলের বিছানা তৈরী থাকত অতিথি আপ্যায়নের জন্য।

—শুনেছি ১৫২৭ সালে ফ্রান্স থেকে রাজদূত চারশ' সঙ্গী নিয়ে এসেছিলেন, তাদের থাকার কোন অসুবিধা হয়নি।

—শুধু থাকার সুবিধাই নয় সেই অতিথিরা বর্ণনা দিয়েছেনে এখানকার ঐশ্বর্যের. লিখেছেন যেদিকে তাকাও অসংখ্য সোনা রূপার পাত্র ঝকঝক্ করছে।

—এত ঐশ্চর্য এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন উলসি, কত বড় মনের জোর।

—উপায় ছিল না। তাঁকে ছাড়তেই হতো। হ্যাঁ. যা বলছিলাম—শুধু সোনা রূপাই নয়, রাজা অষ্টম হেনরির মত উলসির শিল্প কাজের উপর ছিল অসম্ভব ঝোঁক। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আনিয়েছিলেন কার্পেট। ভেনিস থেকে একজন রাজদূত এসেছিলেন, তিনি লিখেছেন, উলসির সঙ্গে দেখা করতে হলে অন্ততঃ পক্ষে আটটি ঘর পার হতে হতো। তার প্রতিটিতে নানান ধরনের বহু মূল্যবান পর্দা, কার্পেট আর সোফা দিয়ে সাজান। এইসব ইত্যাদি আবার প্রতি সপ্তাহে বদল করা হতো।

—রাজকীয় ব্যবস্থা।

—শুনলে অবাক হবে. এক এক ঘরে এক এক দেশের কার্পেট পাতা হ'তো। ১৫২১ সালে ভেনিস থেকে তাঁকে ৬০ খানি কার্পেট উপহার দিয়েছিল।

—উলসি তো রাজা ছিলেন না, তবে এত টাকা পেতেন কি করে? তিনি তো ছিলেন চার্চের লোক।

—হলে কি হবে? তিনি কি মন থেকে কোন দিন এই পথ ধরেছিলেন? তাঁর কামনা বাসনা ছিল আমাদের থেকে অনেক বেশী। ধর্মের নামে টাকা ঘুষ নিতেন. তারপর সপ্তম হেনরীর সময় থেকে রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলেন। টাকার অভাব আর তাঁর হবে কি করে?

—সে অবশ্য ঠিক। তবে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তাঁর উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পী সত্তা আর পরিচ্ছন্ন রুচি ছিল।

—পরিচ্ছন্নতা তাঁর স্বভাবের আচ্ছন্ন অংশ ছিল। তুমি যদি ভালভাবে এই প্রাসাদের নক্সা লক্ষ্য কর তা হ'লেই দেখবে যে এখানকার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চমৎকার। শুধু নর্দামাই নয়, ব্যবহৃত জল যাতে ঠিক ভাবে গিয়ে টেমাস পড়ে তার জন্য ইট দিয়ে সুন্দর নালী করিয়ে দিয়েছিলেন। এত ভালভাবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত সুন্দর ভাবে কাজ দিয়েছে। প্রাসাদ করাই

নয়, তাকে স্বাস্থ্য সম্মত করে রাখাও যে বিশেষ প্রয়োজন তা জানতেন উলসি।

—হয়তো তাঁর দোষ ছিল, তবু এই যে কালজয়ী জিনিষ করেছিলেন, এটা আমরা পেতাম না যদি তাঁর এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি না থাকত।

—ঠিক বলেছ। দৃষ্টিভঙ্গি কত উন্নতমানের ছিল বলছি। পানীয় জল মানুষের জীবনের সব থেকে প্রয়োজনীয়, অথচ সব থেকে সমস্যার জিনিষ; কারণ জল নির্মল, বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এর জন্য তিনি এখানে থেকে তিন মাইল দূরে কুমবে পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে জল আনার ব্যবস্থা করলেন। টেম্‌স নদীর অপর পার থেকে দস্তার পাইপে করে ঝর্ণার জল আনা হতো প্রাসাদে। ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বিনা বাধায় এই জল সরবরাহ হয়েছে। আজও খুঁজে দেখলে বোধ হয় সেই পুরানো দিনের পাইপের সন্ধান পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা মিঃ ডেলডার ফিল্ড, ঐ জল কোথায় এসে জমা হতো?

—জল ঘরের লাগোয়া স্নানাগারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল।··· চল আবার ঐ গার্ডরুমের ভিতর দিয়ে যাই।

যেতে যেতে মিঃ ডেলডারফিল্ড বলছিলেন—জলের ব্যবস্থা ঘরে করেই উলসির মন ওঠেনি, জানা যায় তিনি সুন্দর স্নানাগার করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কাজ সুরুও হয়েছিল, কিন্তু শেষ হয়নি।

—কারণ?

১৫২৯ সালে উলসি রাজার অনুগ্রহ পাবার আশায় প্রাসাদটি তুলে দিয়েছিলেন রাজ অষ্টম হেনরির হাতে।

—তাতে স্নানাগার না হবার কি আছে?

—রাজা তখন উলসির উপর অসন্তুষ্ট, তাঁর সব কাজেই রাজার অসন্তোষ—সেইজন্যই বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া রাজা তখন প্রাসাদটিকে নব নব রূপে সাজাবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

—নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গেলে কি আগের সব বন্ধ করে দিতে হবে?

—হ্যামটন কোর্ট মানেই উলসির সৃষ্টি; তাই রাজার প্রথম আর প্রধান কাজ হলো সর্বত্র নিজের নাম লেখা।

এসে ঢুকলাম একটি ঘরে, দেওয়ালে লাল পাথরের কাজ করা, মাঝে তার

গডক্রে নেল্লারের আঁকা ছবি রয়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম—এই ছবিগুলি কাদের ?

—একটা নিশ্চয় চিনেছ, তৃতীয় উইলিয়ামের। বাকীগুলি হ্যামটন কোর্টের সুন্দরীদের।

—কাঠের পালিশ কী সুন্দর রয়েছে, কোন কাঠ ?

—সব ওক্ গাছের কাঠ।

ঘরের মাঝখানটিতে ঝালরওয়ালা চন্দ্রাতপ, তার মধ্যে রূপোর কাজ করা। তার নিচে মখমলের চেয়ার। চেয়ারের উপরে পর্দার গায়ে রূপোর তার তৃতীয় উইলিয়ামের শিলমোহর লেখা রয়েছে। ঘরটির নাম "কিংস ফার্স্ট প্রেসেন্স চেম্বার।"

ঐ ঘর পেরিয়ে আর একটি ঘরে এলাম প্রায় একই ভাবে সাজান, এটি "সেকেণ্ড প্রেসেন্স চেম্বার।" এই ঘরে একটি সুন্দর আয়না আছে। তারপরে আর একটি ঘর, সেটি অডিয়েন্স চেম্বার। রাজা বোধ হয় এখানে দেখা দিতেন। তারপর রাজার বসার ঘর। এর দেওয়ালের আর্দ্ধেকটা ওক কাঠের বাকীটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাটালির কাজ, পেন্টিং ইত্যাদি দেখার মত।

বসার ঘর থেকে বেরবার আগে মিঃ ডেলডারফিল্ডকে মনে করিয়ে দিই—বললেন যে কি কাহিনী বলবেন।

—একটু পরেই বলব ; আগে রাজার শোবার ঘরটা দেখে নাও।

ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রাজার শয়ন কক্ষই বটে। আগাগোড়া দেওয়াল লাল ব্রোকেট জাতীয় কাপড়েমোড়া। তার মাঝে সুন্দরীদের ছবি। ঘরের মাঝে লাল মখমলের বিছানা। প্রায় ছাত থেকে নেমে এসেছে মশারীর মত ঝালর। ছাতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

আমাকে অভিভূত দেখে মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—কেমন শিল্প দেখছ ?

—অপূর্ব, অনবদ্য !

—বল দেখি এগুলো কার আঁকা ?

—ছাতের পেন্টিংগুলো ?

—হ্যাঁ !

—আমি জানি না, তবে মনে হয় এ্যান্টনিও ভেরিওর আঁকা।

—ঠিক বলেছ। কি করে বুঝলে ?

—দেখে মনে হলো রোমান বা গ্রীক দেব দেবীর ছবি।

—তুমি কি ওদের পৌরাণিক কাহিনী জান ?

—না, ছবি দেখেছি তো, তাই বুঝলাম।

—সিঁড়ির ধারে দেখেছ এক ধরনের ছবি আর শয়নকক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। এখানে দেব, দেবী বা যে সব পাত্র পাত্রীদের ছবি আঁকা হয়েছে সবাই ঘুমের মধ্যে রয়েছেন বা আলস্য উপভোগ করছেন। শিকারী এনডিমিত্তন ঘুমের দেবতা মোরফেয়াসের কোলে ঘুমিয়ে আছে।

—চমৎকার! এর লাল মখমলের বিছানা, চেয়ারের কাপড়, সবই সুন্দর!

—এগুলি তৃতীয় উইলিয়ামের সময়কার।

পাশের ঘরটি রাজার সাজঘর। এর ছাতেও এ্যান্টিনিও ভেরিওর ছবি, ভেনাসের কোলে মার্স। এছাড়া অষ্টম হেনরির সময়কার 'আদম আর ইভে'র ছবি। এই ঘরের পাশে ছোট্ট ঘর, সেটি রাজার লেখার ঘর। এখান দিয়ে একটি সরু সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানে। এই ঘরটিতে একটি আয়না রয়েছে, তাতে তাকাতে দেখলাম পাশের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে।

এই কথা বলতে মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন ঐ আয়না এমন করে রাখা হয়েছে যাতে রাজা এখানে বসেই সব দেখতে পান।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন, এবার একটি কাহিনী বলছি। অনেক দিন আগে—তখন আমি নেহাৎই কম বয়সী, বলতে গেলে যৌবন সন্ধিক্ষণে। এই প্রসাদে আমার কাকার সঙ্গে আসতাম। একদিন রাতে কাকার ডিউটি ছিল, আমিও ছিলাম। অনেকক্ষণ জেগে থেকে এক সময় ঘুম এসে গেল। কাকা বললেন, তুমি এঘরে ঘুমোও, আমি যাচ্ছি। দিব্বি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বড় ঘড়িটায় দুটো বাজল? সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আবার ঘুমবার চেষ্টা করতে যাব, দেখি ধীরে ধীরে ঐ নিচে যাবার দরজাটা খুলে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হলো, তারপর মনে পড়ল আমার কাকা ঐ পথেই নেমে গেছেন। আশ্বস্ত হলাম, তিনি আসছেন। একটু পরেই ভুল ভাঙ্গল, কাকা নয়, এমন কি কোন পুরুষমানুষও নয়, এক নারী। আবছা আলোয় মনে হলো তরুণী। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। অন্ধকার রাত, সে আর আমি! উত্তেজনায় উঠে বসলাম। লক্ষ্য করলাম তাকে, মনে হলো সে যেন ভয় পেয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে?

'হুস্' মুখে আওয়াজ করে ঠোঁটে আঙ্গুল দিল।

আমি চুপ করে রইলাম।

সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। স্থির হয়ে আসা রক্তে আবার তরঙ্গ উঠতে সুরু করে। সে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে আমার পাশে হাটু গেড়ে বলল—আচ্ছা, তুমি কি এ্যাণ্টনিওকে দেখেছ?

আমার কাকার নাম এ্যাণ্টনি। আমি ভাবলাম তাঁর নাম ভুল করে বলছে। বললাম—এ্যাণ্টোনিও নয় এ্যাণ্টনি আমার কাকা।

অধৈর্য ভাবে বললে—না, না তার কথা নয়···কিন্তু কথা সমাপ্ত করতে পারলো না, তার আগেই রাজার বসার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো এক তরুণের মূর্তি। মেয়েটির কথা শুনছিলাম তাই তাকে আগে লক্ষ্যই করিনি। তরুণী তাকে দেখেই সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ক্ষিপ্র গতিতে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলে বলল—এ্যান, তুমি কি আমার কথা বুঝবে না?

—ছাড়ো, আমাকে ছেড়ে দাও, না হলে আমি বাবাকে ডাকব।

—তুমি আমার ভালবাসার কোন মূল্যই কি দেবে না?

—ভালবাসা? তুমি ওকে ভালবাসা বল?

—তবে কি তুমিই বল?

—দৈহিক ক্ষুধা, কামনা···

—ভালবাসা মানেই কামনা। তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে দেখেছ কি, যে বলছ দেহের ক্ষুধা?

—তোমার চোখ লালসায় জ্বলজ্বল করছে, ধরা দেবার দরকারই নেই, এমনিই বোঝা যাচ্ছে।

এতক্ষণ যুবকটি বেশ ঠাণ্ডা এবং ভদ্রভাবে কথা বলছিল। এ্যানের শেষ কথা শুনে হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে বলল—আমার চোখে লালসা! ঠিক আছে ঐ লালসার আগুনেই তোমাকে পোড়াব।

তারপরই এ্যানাকে এক টান দিল। সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল আর বাবা বাঁচাও, কে আছ বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। বুঝতেই পারছ আমার মধ্যে তরুণের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে, আমি তাকে বাঁচাবার জন্য উঠে সিঁড়ির দিকে দৌড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে তারা কোথায় মিলিয়ে গেল। আর সিঁড়ির দরজা খুলে কাকা ঢুকলেন।

আমাকে উত্তেজিত অবস্থায় সিঁড়ির কাছে দেখে কাকা প্রশ্ন করলেন—কী

ব্যাপার, এখানে, এখন ?

প্রকৃতিস্থ হতে বেশ সময় লাগল. তারপর ধীরে ধীরে বললাম ঘটনা। সব শুনে তিনি বললেন—এ্যান্টোনিও ভেরিও, খুবই বড় শিল্পী, কিন্তু ওনার মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল, তাই মৃত্যুর পরও শান্তি পাচ্ছেন না।

কাকাকে প্রশ্ন করেছিলাম—ভেরিও কোথায় মারা গেছেন ?

—এখানেই হ্যামটন কোর্টে।

—সমাধি কোথায় ?

—ঐ যে ভাঙ্গা গীর্জা আছে, সেখানে।

মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন—কাহিনী শোনা হলো, চল এবার অন্য ঘর দেখবে।

আমি খুঁত খুঁত করে বললাম—গল্পটা ভাল, কিন্তু সিঁড়িতে উঠতে উঠতে যে কাহিনী বলবেন বলেছিলেন, এটা নিশ্চয় সেটা নয়। তখন তো রাজাদের জাঁক-জমক আর খরচের কথা হচ্ছিল।

—ঠিক মনে পড়ছে না তখন কি বলতে চেয়েছিলাম, মনে হয় গ্রেট হলের কথাই বলব ভেবেছিলাম।

—গ্রেট হলটা কোথায় ? শুনেছি রাজা ওটা অ্যানবোলিনের জন্যই করিয়ে ছিলেন।

—হ্যাঁ, তাই। ঐ ঘরটির কথা ওখানে গিয়ে বলব। চল অন্যান্য ঘরগুলো দেখবে।

লেখার ঘরটি পেরিয়ে আর একটি ছোট্ট ঘরে এলাম। এই ঘরটিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি রয়েছে। নাম কুইন মেরীস ক্লসেট।

প্রশ্ন করলাম—এখানে এই ছোট্ট ঘরেই কি রাণী মেরী থাকতেন ?

উনি হেসে বললেন—না, না এতে কোনদিনই রাণী থাকেননি।

—তবে এই ঘরটার নাম মেরীর ঘর হলো কেন ?

—রাণী মেরী আর তাঁর সঙ্গিনীরা অনেক শুঁচের কাজ করেছিলেন, সেগুলো এক সময় এখানকার দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকত, সেই থেকে এই নাম। ঘরটির আসল কাজ রাজা আর রাণীর সংযোজক। এই ঘরের পরের অংশটি রাজা তৃতীয় উইলিয়াম নতুন করে করিয়েছিলেন।

আমরা মেরীর ঘর ছেড়ে পুবদিকে গেলাম। মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—উইলিয়াম আর মেরী এসব আরম্ভ করলেও মেরীর মৃত্যুর অনেক দিন পর

উইলিয়ামের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তিনি বেশ কিছুদিনের জন্যে কাজ করাবার কোন তাগিদ পাননি।

—মেরী খুব কম বয়স মারা গিয়েছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। ১৬৯৪ সালে ২৮ শে ডিসেম্বর মেরী বসন্ত রোগে মারা গেলেন।

—এই বাড়ীতেই ?

—না, কেনিংটন প্যালেসে। রাণী মেরী আর উলিয়াম খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। বিশেষ রাণী মেরী তিনি নদীর ধারে সুন্দব করে ঘর করাচ্ছিলেন, সঙ্গে মার্বেল পাথরের স্নানাগার। নদীর ধারের বারান্দায় উইণ্ডসার ক্যাসেলের সুন্দরীদের প্রচুর পেন্টিং ছিল।

—কাজ কি আর হয়নি ?

—হ্যাঁ হয়েছিল। ১৬৯৪ সালে হোয়াইট হলে আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায়, উলিয়াম আবার হ্যামটন কোর্টে ফিরে আসেন। সেই সময় এ্যাণ্টনিও ভেরিও পেন্টিং এর কাজ করেন আর ফরাসী দেশের জিন টিজু রেলিং এবং ফটকের কাজ করেছিলেন। চল এবার আমরা কুইনস গ্যালারি দিয়ে রাণীর শয়ন কক্ষে যাই।

এবার আমরা এলাম বিশাল দীর্ঘ এক ঢাকা বারান্দায়। শুনলাম এর দৈর্ঘ্য ৮০ ফিট। কাঠের মেঝে, কাঠের সুন্দর খাঁজ কাটা দেওয়াল। কাঠের কাজ করেছিলেন গ্রিনলিং গিবসন। মাঝে মাঝে মার্বেলের চিমনি, করেছিলেন জন নস্ট।

মিঃ ডেলডারফিল্ড বলে চলেন ইতিহাস।

আমি প্রশ্ন করলাম—সবই কি উইলিয়াম করিয়েছিলেন ?

—না, না, এতে রাণী অ্যান, প্রথম জর্জ এবং অন্যান্য অনেকের অবদান রয়েছে। বিশেষ করে প্রথম জর্জের কথাই বলব, তিনি ব্রাসেলস থেকে ওখানকার বিখ্যাত বয়ন শিল্পী চার্লস লি ব্রাণ এর তৈরী কার্পেট আনিয়ে কুইনস গ্যালারিতে টাঙ্গিয়ে ছিলেন।

সুন্দর নীল আর শাদা কাঁচের ফুলদানীগুলির নিখুঁত কাজ দেখতে দেখতে চোখে পড়ল তাতে রয়েছে একটি পুরুষ আর একটি নারীর হাত। আমি বললাম —হাত দুটি দিয়ে বেশ দেখাচ্ছে। এটা কি কোন সিমবল ?

—হ্যাঁ, এই ফুলদানীগুলি টিউলিপ রাখার জন্য করা হয়েছিল এবং উইলিয়াম

আর মেরীকে উপহার দেওয়া হয়। এঁরা দুজনে মিলিতভাবে রাজত্ব করতেন, তাই দুজনের হাতে হাত বদ্ধ অবস্থায় দেখান হয়েছে।

কথা বলতে বলতে মিঃ ডেলডারফিল্ড এগিয়ে চলেন, তাঁকে অনুসরণ করি।

এবার এলাম রাজকীয় ভাবে সজ্জিত একটি ঘরে, কুইনস্ বেডরুম। ছাদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, রাজাদের সিঁড়ির মাথায় যেমন দেখেছিলাম তেমনি অপূর্ব পেন্টিং এর কাজ, তেমনি রোমান দেবদেবীর মূর্তি।

আমি উৎসাহিত হয়ে বলি—নিশ্চয় এগুলি এ্যাণ্টোনিও ভেরিওর আঁকা?

মিঃ ডেলডারফিল্ড হেসে বললে—হলো না। এটা ভেরিওর আঁকা নয়। তুমি নিশ্চয়ই রোমান দেবদেবী দেখে অনুমান করেছ?

আমি বললাম—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

—এ্যাণ্টোনিও ভেরিও মারা যাবার অনেক পরে রাজা প্রথম জর্জ এগুলি আঁকান। এর শিল্পী থর্ণহিল। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, রথে চড়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসছেন ঊষা দেবী আরোরা। তাঁর পায়ের কাছে রয়েছে, রাত্রি আর নিদ্রা। ধারে ধারে নানান মূর্তির সঙ্গে রয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় জর্জের আর রাণী ক্যারোলিনের প্রতিকৃতি।

পেন্টিং এর পাশে নিখুঁত বাটালির কাজ, ঘরের সাজসজ্জা, ঝাড়বাতি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হলো এমন শিল্প এমন প্রাচুর্য—একি এক কথায় ছেড়ে যাওয়া সম্ভব? তাই বোধ হয় আত্মারা বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে।

দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম—এখানে কোন রাণী বেশী থেকেছেন?

—প্রথম জর্জের স্ত্রী সোফিয়া, দ্বিতীয় জর্জের স্ত্রী ক্যারোলিন, ফ্রেডরিকের স্ত্রী আগস্টাস··· অবশ্য এর মধ্যে ক্যারোলিনই বেশী থেকেছিলেন।

আমাকে ঘরের মধ্যে তন্ময় হয়ে ঘুরতে দেখে মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন—তোমাকে তো আজ ফিরতে হবে?

—হ্যাঁ তাতো হবেই?

—তা হলে আর দেরী করো না, আরও অনেক কিছু দেখার আছে, অবশ্য সব দেখা যাবে না।

তাঁকে অনুসরণ করে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। উনি বাঁ ধারের একটি ঘর দেখিয়ে বললেন—ওটা রাণীদের খাস কামরা।

—ওটা দেখবো না?

—নতুন কিছু নয়, যেমন এগুলো তেমনই। বরং এর পরে কুইনস্ ড্রইংরুমটা দেখার মত। সেটাতেই যাচ্ছি এখন।

বিশাল বসার ঘর, ছাদে পেন্টিং, অপূর্ব বাটালির কাজ দেখলে মনে হয় না এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরনো।

মিঃ ডেলডারফিল্ড উত্তর দিকের দেওয়ালের বিশাল বিশাল পেন্টিংগুলো দেখিয়ে বললেন—এগুলো সব ভেরিওর আঁকা। ফায়ার প্লেসের ওপর ঐ ছবিটা দেখ।

বিশাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন রাজা বৃটিশ নৌবহরের দিকে ইঙ্গিত করছে। দেখে বললাম—সুন্দর ছবি!

—ছবি অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু এর মধ্যে যে ইঙ্গিত রয়েছে সেটা ইংবাজরা পছন্দ করেননি, সেজন্যে ১৭৪১ সাল থেকে এটি ঢেকে রাখা হয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই ছবিটি সাধারণকে দেখানোর ছাড়পত্র পায়।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—এ ছবি না দেখাবার কি কারণ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঐ যে রাজার ছবি দেখছ তিনি হচ্ছেন রাণী অ্যানের স্বামী, ডেনমার্কের প্রিন্স জর্জ। ইংরাজদের সঙ্গে ডেনমার্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই বোধ হয়!

পাশের দেওয়ালে রাণী অ্যানের ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম—এই ছবিটিতে কি বলা হয়েছে?

হেসে উত্তর করলেন—রাণীকে পৃথিবীর চারদিক থেকে সম্মান জানাচ্ছে।

সুন্দর মখমলের বিছানা দেখিয়ে মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—এটা অ্যানের জন্যে করা হয়েছিল।

বিছানা বা সোফার কাপড় দেখলে মনে হয় অল্প কিছুদিন আগেই করান হয়েছে, তাই প্রশ্ন করলাম—এই যে ভেলভেটের কাপড়, এগুলি কি এখনকার?

—না, না এ সব সেই আমলের।

মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না, সত্যিই এরা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান। সারা ঘরটি নানা ধরনের নানা মাপের চেয়ার এবং গদি আঁটা বেঞ্চি দিয়ে সাজান।

মিঃ ডেলডারফিল্ড তাড়া লাগালেন। আমি তখন জানলা দিয়ে বাইরের তাকিয়ে দেখছিলাম। বাগান, রাস্তা, ফোয়ার—কি সুবিন্যস্তভাবে রয়েছে।

যদিও যেতে ইচ্ছা করছিল না, তবু এ ঘর পিছনে রেখে এগিয়ে চললাম।

বাঁদিকের একটি ঘর দেখিয়ে বললেন,—এটি রাণীর খাবার ঘর। পরের বড় ঘরটি দ্বিতীয় জর্জ আর স্ত্রী ক্যারোলিন সাধারণের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যবহার করতেন।

ঘুরতে ঘুরতে একটি বিশাল ঘরে এলাম। এর নাম পাবলিক ডাইনিংরুম। দ্বিতীয় জর্জ এটিকে খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। কারণ তিনি নিজে ভোজন রসিক ছিলেন আর খাওয়াতে ভাল বাসতেন। তাঁর সময় প্রায়ই ভোজ লেগে থাকত। ঘরটি কিন্তু করা হয়েছিল সঙ্গীতের আসর জমাবার জন্যে।

এই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম একটি সিঁড়ি, কিন্তু অন্য সিঁড়ির মত অমন জমাকাল নয়।

মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—এই দিকটাকে বলে প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইট। সি ড়িটিও ঐ নামে—এই ঘর, বসার ঘর সব।

—প্রিন্স অব ওয়েলস, মানে হবু রাজা, তাই না?

—হ্যাঁ, তাই বলা যায়।··· চল, ঐ ঘরটার কাছে একটা কাহিনী বলব।

এতক্ষণ মধ্যযুগের শিল্পকলা দেখতে দেখতে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে মনেই ছিল না কাহিনী শোনার কথা। তাড়াতাড়ি বললাম, বলুন বলুন কি কাহিনী।

—তিনি স্বরু কবেন। অনেক দিন আগের কথা বলছি, আমার তখন রাতে এখানে ডিউটি ছিল। এই চত্তবেই ঘুরছিলাম। এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সম্ভবতঃ তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কিছুর শব্দ শুনে আমি সজাগ হয়ে উঠতেই দেখি একজন যুবক এক তরুণীর হাত ধরে টেনে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে চেষ্টা করছে। মেয়েটি যাবে না তখন ছেলেটি বলল—আগষ্টা চলে এসো, আমি এমন পাপের জায়গায় থাকব না।

মেয়েটি মিনতি করে বলে—তুমি তো জান আমার শরীর এখন ভাল নয়।

—তাই জন্যেই তো আরও চলে যেতে চাইছি, আমাদের সন্তান এখানে জন্মালে এই রকমই হবে।

যখন এদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে তখন পাশের ঘর থেকে বয়স্ক একজন মানুষ বেরিয়ে এসে বজ্র গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—জানতে পারি কি, এখানে কি অন্যায় হচ্ছে?

যুবকটি উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল—নিজেকেই প্রশ্ন কর। ওয়ালপোলের আজ্ঞাবহ হয়ে গেছ, তাই কিছুই বুঝতে পারছ না।

কখন আর একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা কেউই জানতে পারিনি। যুবকটি থামতেই মহিলা বলেন—পুত্র আমার, অভিমান করতে নেই। যাই হক উনি তোর পিতা, আয়, উঠে আয়।

—না, আমি ফেরার জন্যে নামিনি। চল আগাষ্টা।

বজ্র গম্ভীর স্বরে বয়স্ক মানুষটি বললেন—ঠিক আছে, যাও, আর কোন দিন ফিরে এসো না।

যুবকটি কোন কথা না বলে প্রায় টেনে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ শুনে এবার আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, আপনি এই ঘটনা দেখলেন, তাদের কাউকে কিছু বললেন না?

—এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছু বলতে পারিনি। দেখলাম মহিলাটি দৌড়ে চলে গেলেন কুইনস চ্যাপেলে। তারপরে সব কেমন অদৃশ্য হলো। আমি প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলাম না, কিছুক্ষণ পরে যখন আকস্মিকতা কেটে গেল তখন ভীষণ ভয় হতে লাগল। আমিও দৌড়ে চলে গেলাম আমার কাকার কাছে।

সব শুনে কাকা বললেন—তুমি দ্বিতীয় জর্জকে দেখেছ। তাঁর ছেলে ফেড্রিক ছিল ভীষণ অভিমানী আর আদর্শবাদী। সে পছন্দ করত না তার বাবা ওয়ালপোলের কথার এত বাধ্য হয়। এই নিয়ে তাদের মতের অমিল। বেচারা ফ্রেড্রিক বাঁচেওনি বেশী দিন। সিংহাসনে বসা হয়নি তার।

হঠাৎ থেমে গেলেন মিঃ ডেলডারফিল্ড তারপর বললেন—আর গল্প নয় এবার প্রাসাদটা দেখো।

একটু এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যাবার পরই দেখলাম একটি ভজনাগার।

বললেন—এর নাম চ্যাপেল রয়েল।

হঠাৎ বাসে শোনা ঘটনা মনে পড়ে যেত বললাম—এইখানেই অষ্টম হেনরী প্রার্থনা করতেন?

—হ্যাঁ, ঠিক কথা। তুমি বুঝি হনটেড গ্যালারির কথা জেনেছ?

—বাসে আসতে আসতে মিসেস হাওয়ার্ড যে আমাকে বলেছিলেন।

আমরা চ্যাপেলে ঢুকলাম।

রাজকীয় প্রার্থনাগারই বটে। সোনালী রং করা কাঠের কাজের তুলনা হয় না। মানস চক্ষে যেন দেখতে পেলাম অষ্টম হেনরী বসে রয়েছেন, আর চ্যাপলিন মন্ত্র পাঠ করছে।

মিঃ ডেলভারফিল্ড জানালেন—এই প্রার্থনাগারটি বড় আর কুইনস প্রাইভেট চ্যাপেলটি ছোট। এটি বেশী ব্যবহার করতেন রানী ক্যারোলিন। ধর্মপ্রাণ ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন করি—চ্যাপেল রয়েল কার করা?

—করিয়েছিলেন কার্ডিনাল উলসি। তবে এই চ্যাপেলকে অলঙ্কৃত করেছেন অষ্টম হেনরী। তাকিয়ে দেখ গোলাকৃতি ছাতের রং নীল, তাতে অসংখ্য তারা জ্বলছে বলে মনে হয়। কাঠের কাজ, কাঁচের জানলা সবই ঐ সময়কার। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু সংস্কার করা হলেও নক্সা আগের মতই রাখা হয়েছিল।

আমি এবার তাগিদ দিয়ে বলি—চলুন সেই হনটেড গ্যালারি দেখব।

গেলাম।

দীর্ঘ বারান্দা। ধারে ধারে কার্পেট ঝুলছে। শুনলাম ওগুলি রানী এলিজাবেথের। আগে এখানে অনেক পশুর শিং দিয়ে সাজান ছিল। কিন্তু পরে সেগুলো সরিয়ে অন্য একটি ছোট ঘরে রাখা হয়, যার নাম হর্নরুম। হনটেড গ্যালরি তৈরি করিয়েছিলেন টমাস উলসি। এরই একধারে চ্যাপেল রয়েল। প্রথম এটি তৈরী করিয়েছিলেন উলসি। পরে ১৫৩৫-৩৬ সালে নতুন করে সাজিয়েছিলেন অষ্টম হেনরী।

আমি প্রশ্ন করলাম—এখানেই বুঝি রাজা উপাসনা করতেন, আর এখানেই রানী ক্যাথেরিন প্রাণ ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

—ঠিক ধরেছ।

মিঃ ডেলভারফিল্ড বললেন—চল এবার তোমাকে হ্যামটন কোর্টের শ্রেষ্ঠ ঘরটি দেখাব। এটর নাম গ্রেট হল।

আমরা এ্যানবোলিন গেটের কাছাকাছি এসে পড়লাম। প্রবেশ করলাম এক বিশাল কক্ষে। দুধারে পেন্টিং এর কাজ। কাঠের মেঝের মাঝখানটা উঁচু। প্রশ্ন করলাম এখানটা উঁচু কেন?

—এখানে রাজা তাঁর প্রিয় বন্ধু, বয়স্যদের নিয়ে ভোজ সভা বসাতেন। কেমন দেখছ ঘরটা?

—চমৎকার, আর কি বিশাল!

—সত্যিই বিশাল, এটা লম্বায় ১০৬ ফিট, প্রস্থে ৪০ ফিট, আর উচ্চতায় ৬০ ফিট। এর এক ইতিহাস আছে।

—বলুন শুনি।

—রাজা অষ্টম হেনরী তাঁর প্রিয় স্ত্রী এ্যানবোলিনের জন্য এটা করান। অবশ্য উলসি একটা হল এখানে করিয়েছিলেন, কিন্তু সে অতি সাধারণ। হেনরী প্যারিসের লুভার প্রাসাদের ঘরের ছাঁদে এটি তৈরী করালেন। কাজ করতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। তবু রাত দিন কাজ চলেছিল। দুঃখের বিষয় যার উদ্দেশ্যে এই ঘর তৈরী হলো তার ভোগে এটা লাগল না। তার শিরশ্ছেদ হবার পর এই ঘরের কাজ শেষ হয়েছিল।

ছাতে কাঠের কাজের মধ্যে মধ্যে সুন্দর আলো ঝুলছে। দেখতে দেখতে নজরে পড়ল ইংরাজী এ বি আর এইচ অথার।

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, ওখানে এবি, আর এইচ রয়েছে কি এ্যানবোলিন আর হেনরীর নামের অদ্যক্ষর ?

—হ্যাঁ। তবে অ্যানবোলিন মারা যাবার পর হেনরীর তৃতীয় স্ত্রী জেন এর নামের অদ্যক্ষর জে এস লিখিয়েছিলেন এবির স্থানে।

—এবি অক্ষর যে রয়েছে ?

—একটা দুটো থেকে গেছে।

—আলোর কাজগুলো কী সুন্দর !

—হবে না কেন বল ? ওগুলো যে লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্পী রিচার্ড রিজের তৈরী।

—এ্যানবোলিনের জন্য দুঃখ হয়, বেচারা এমন সুন্দর ঘরটি পেল না।

—আমার তো দুঃখ হয় জেন সাইমোরের জন্য।

ভবিষ্যৎ রাজার জন্ম দিয়ে তের দিন বাদে মারা গেল। এই ঘরে জেন এর মৃতদেহ উইন্ডসার ক্যাসেলে নিয়ে যাবার আগে প্রায় তিন সপ্তাহ রাখা হয়েছিল। সোনার পাত দিয়ে দেহ মুড়ে দেওয়া হয়েছিল, মাথায় মুকুট হাতে আর গলায় মণি মুক্তার হার পরিয়ে রাখা হয়েছিল মৃতদেহকে। শোনা যায় শিশুপুত্রের ধাত্রী মিসেস সিবেল পেন নাকি দেখেছিলেন জেন সাইমোরের মৃতদেহ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল তার শিশুপুত্রের কাছে। সে তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর বেশীদিন বাঁচেনি মিসেস সিবেল।

—কি হয়েছিল ?

—তা জানি না। তবে বহুদিন পর্য্যন্ত হ্যামটন কোর্টের মানুষ মিসেস সিবেলকে দেখেছে এই ঘরে ঘুরে বেড়াতে।

—এখানে ভোজ হতো বললেন তো ?

—হ্যাঁ, এখানে বড় বড় ভোজের ব্যবস্থা হতো।

—তাহলে তো নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রান্নাঘর এবং পানীয় ইত্যাদির ঘর আছে।

—নিশ্চয়, গ্রেটহলের নিচেই কিংস ওয়াইন সেলার। চল যাই।

একতলায় এসে আমরা কিংস ওয়াইন সেলারে গেলাম। ঘরটির মাঝে তিনটি থাম ছাতটিকে ধরে আছে বলে মনে হয়। অনেকগুলি কাঠের পিপে রয়েছে।

মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—আজ নিস্তব্ধ ভাটিখানা দেখে বুঝতেই পারবে না এটা একসময় কত কর্মব্যস্ত ছিল।

—এর কর্মব্যস্ততা তো রাত্রে।

—না, না, হ্যামটন কোর্টের সেলার সর্বদা চঞ্চল থাকত। উদার হাতে পানীয় দেওয়া হতো কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পুরুষ, কি নারী। সম্মানিত মহিলাদের এক একজনকে প্রাতঃবাশে এক গ্যালন, নৈশ ভোজে এক গ্যালন, দ্বিপ্রহরে আধ গ্যালন, এবং বিকালে আধ গ্যালন পানীয় দেওয়া হতো।

—কত পানীয় লাগত, ভাবতে অবাক লাগে।

—তাও তো এখনও বলিনি যে হ্যামটন কোর্টে সর্বদা কমপক্ষে পাঁচশ জন বাসিন্দা থাকতই এবং তাদের প্রত্যেকের বরাদ্দ বিয়ার এবং ওয়াইন পেত। বিয়ার প্রাসাদেই তৈরী হতো, কিন্তু ওয়াইন আনানো হতো বাইরে থেকে। ওয়াইনের ভাণ্ডার ছিল রাজার খাস ওয়াইন সেলার।

দেখলাম একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। প্রশ্ন করলাম—ঐ সিঁড়িটা কি গ্রেট হলে গেছে ?

—না, ওটা হর্নরুমে গেছে। ঐ ঘরটিতে খাবার পানীয় ইত্যাদি পরিবেশন করার জন্য রাখা হতো।

—রান্নার কথা বলতে মনে হচ্ছে, এত যেখানে মদের ব্যবহার সেখানে নিশ্চয়ই রান্নারও বিশাল ব্যাপার ছিল।

—অবশ্যই ছিল। উলসি নিজে খাদ্য রসিক ছিলেন, তারপর এলেন অষ্টম

হেনরী। তাঁর তো নানান খেয়াল ছিল যার মধ্যে রান্নাও একটি। চল এবার সেদিকেই যাই।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে চওড়া একটা উঠানে পড়লাম। মিঃ ডেলডারফিল্ড জানালেন এইখানে রান্নার জিনিষ এসে জমা হতো, আবার এখান দিয়ে বাড়ীর বাসিন্দাদের খাবার দেওয়াও হতো। আবার এরই একপাশে একটা সিঁড়ি হর্ণরুমে উঠে গেছে। কাছে প্রশস্ত জায়গা, যেখানে একদল ভৃত্য হর্ণরুমে খাবার নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করত।

এইখান থেকে ছোট দরজা পেরিয়ে বিশাল এক ঘরে পড়লাম। কেউ না বুঝিয়ে দিলেও অনুমান করতে কষ্ট হলো না এটি রান্না ঘর।

বিশালত্ব দেখে বললাম—সত্যিই রাজাদের খাবার দৃষ্টি ছিল প্রখর।

হেসে মিঃ ডেলডার ফিল্ড বললেন—একথা বলছ কেন?

—কত বড় রান্না ঘর! তাতেই মনে হয় রাজারা খাদ্য রসিক ছিলেন।

—বলতে গেলে এই রান্না ঘরটি তো সংযোজন। উলসির রান্না ঘরও ছিল বিশাল।

—সেটা কোথায়?

—পাশেই। পরে দেখাব। আগে এটা দেখ।

তিনি জানালেন—এটি ৩৭ ফিট দীর্ঘ আর ২৭ ফিট প্রস্থ। উত্তর দিকের দেওয়ালে রয়েছে এক বিশাল ফায়ার প্লেস। পাথর আর ইঁটের খিলান দেওয়া। এটির মধ্যে পরবর্তীকালের ফায়ার প্লেস করা হয়েছে। বিপরীত দিকের দেওয়ালে দুটি ফায়ার প্লেস সব থেকে ভাল লাগল, এখনও সেই ফায়ার প্লেসের ধারে রোস্ট করার জন্য লোহার সিক সাজান রয়েছে। আরও আকর্ষণীয় রান্নার বাসনগুলো।

আমি সেগুলো দেখিয়ে বললাম—বাসন দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। কত বিচিত্র রকম বাসন ব্যবহার হতো।

মিঃ ডেলডারফিল্ড বললেন—এইসব রান্নার সরঞ্জাম কিন্তু এক সময়ের নয়।

—কোন সময়ের?

—ডান দিকেরগুলি অষ্টম হেনরীর সময় প্রধান পাচক যা ব্যবহার করতেন। আর বাঁ দিকেরগুলি জর্জদের সময়কার।

এরপর এলাম উলসির রান্না ঘরে।

ঘরটি বেশ বড়, লম্বাটে ধাচের।

—উলসির রান্নাঘর পছন্দ হয়েছে ?

উদ্গ্রীব চোখে দেখছিলাম। প্রশ্ন করলে চমকে তাকাতেই মিঃ ডেলভার 'ফিল্ড বললেন—এখন তো রান্নাঘর ছোট করে দিয়েছে। প্রথমে ছিল ৪৮ ফিট লম্বা। পরে এটিকে ছোট ছোট করা হয়েছিল। রাজার পরিবার এত বড় যে তাতেও স্থান সঙ্কুলন হলো না। তখন রাজা অষ্টম হেনরী ঐ রান্নাঘরটি করালেন।

—কত বড় ছিল উলসির রান্না ঘর ?

—এটা ছিল ৪৮ ফিট দীর্ঘ। দ্বিতীয় জর্জের সময় রান্না ঘরটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি দেওয়ালে তিনটি ফায়ার প্লেস, অপর দেওয়ালে একটি। পরে ঐ ফায়ার প্লেসের মধ্যে উনুন করা হয়েছিল।

উনুনের গায়ে রোষ্ট করার সিক্গুলো দেখলে মনে হয় যেন এখনই কেউ কিছু করেছে।

—জান, অনেকেই আজও এত বছর পরেও কোন কোনদিন রান্নাঘর থেকে মাংসের গন্ধ পায়। বাসনপত্রের আওয়াজ শোনা যায়···।

—বলুন না ভালভাবে, কি হয়েছিল।

—আমার কাকা একবার যা দেখেছিল সেটাই বলে চলে যাব। কাকা একদিন সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ী যাবেন, এমন সময় নাকে এলো রোষ্টের গন্ধ। বলাই বাহুল্য রসনা সরস হয়ে উঠল, তিনিও গন্ধ অনুসরণ করে করে এই কিচেনে চলে এলেন। দেখলেন এক মহিলা একটি প্লেটে মাংসের রোষ্ট সিক থেকে খুলে রাখছে। কাকা কাছে যেতেই সে সেটি এগিয়ে দিল। কাকা হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে যেতেই সারা ঘর অট্টহাসিতে ভরে গেল। কাকা অবাক হয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। তিনি ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করেছিলেন যে তাঁর বন্ধু বা সহকর্মীরা ছুটে এসেছিল। পরে কাকা জেনেছিলেন রানী মেরীকে নাকি প্রায়ই রান্না ঘরে দেখা যায়। আর দেখা যায় রুক্ষ স্বভাবা মিসেস হ্যাকেটকে।

—তিনি কে ?

—হ্যামটন কোর্টের অন্দর মহলের কেয়ার টেকার গোছের আর কি! এবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে হ্যামটন কোর্টের কথা। চল অষ্টম হেনরীর টেনিস কোর্টটা দেখিয়ে আনি।

—রাজা বুঝি টেনিস খেলতেন ?

—অষ্টম হেনরী খেলাধূলো করতে খুবই পছন্দ করতেন, আর ছিল বাগানের শখ। সাত একর জমি নিয়ে তৈরী করেছিলেন সুন্দর বাগান। পরে অনেক রদ বদল হলেও এখনও এখানে প্রচুর ফল ফুল হয় এবং বাগানও রয়েছে।

—হেনরীর কি এটাই প্রধান প্রাসাদ ছিল।

—সে কথা বলা যায় না, তবে এখানে তিনি অনেক দিন কাটিয়েছেন। ষষ্ঠ স্ত্রী ক্যাথেরিন পরে স্বামী অষ্টম হেনরীকে নিয়ে অনেক সুন্দর, উদ্বেগহীন দিন কাটিয়েছেন, কখনও তাঁদের সঙ্গে থেকেছে কন্যা মেরী বা এলিজাবেথ। রাজকুমার এডওয়ার্ড তো সর্বদাই থাকত।

অষ্টম হেনরীর পর বেশ কিছুদিন আর এখানে কোন রাজা বা রানী বাস করতে আসেননি। যখন প্রথম জেমস রাজা হলেন তখন স্ত্রী ডেনমার্কের এ্যানকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

—উলসি তো এটা ষোড়শ শতাব্দীতে সুরু করেন, তার আগে এখানে কি ছিল?

—এই এখানকার ভূসম্পত্তির ইতিহাস অবশ্য আরও প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জেরুজালেমের সেণ্ট জন সংস্থা এখানে গম্বুজওয়ালা এক বাগান বাড়ী করালেন। অবশ্য তাঁরাই শুধু ভোগ করতেন না।

—কারণ কি?

—কারণ কিছুই নয়, ভাল জিনিষে সর্বদাই রাজাদের অধিকার থাকে। কাছাকাছি থাকতেন তৃতীয় এডওয়ার্ডের ছেলে যাঁকে বলা হতো ব্ল্যাক প্রিন্স। তাঁকে রাজা হ্যামটনের কাছাকাছি থাকার জন্য প্রাসাদ দিয়েছিলেন। টেমস নদী দিয়ে যেতে যেতে রাজপুত্রের নজর পড়ল বাগান বাড়ীটির ওপর। কাজেই সেণ্টজনকে ঐ বাড়ীটিকে অতিথিশালা করতে হলো।

—তারপর?

—এই রকমই চলছিল। সপ্তম হেনরী প্রাসাদের সংস্কার করান, সেই সময় প্রায়ই তিনি হ্যামটনে থাকতেন। একবার এক ঘটনা ঘটেছিল। সপ্তম হেনরীর স্ত্রী এলিজাবেথ কোন কারণে নৌকা বিহারে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় সাতদিন এখানে নির্জন বাসে কাটান।

কারণ কি?

—তা ঠিক জানি না, হয়তো রাজবাড়ীর নিত্য নতুন হৈচৈ থেকে কয়েক দিনের ছুটি পেতে চেয়েছিলেন। এই সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। দুঃখের

বিষয় এই যে ফিরে এসে টাওয়ার অব লণ্ডনে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হলো এবং নব জাতকও বাঁচেনি। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

মিঃ ডেলডার ফিল্ড বলতে বলতে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে না তো ?

—না, না, আমার একটুও দেরী হচ্ছে না। আপনার যদি অবসর থাকে আর অসুবিধা না হয় তবে বলুন।

—অসুবিধা হবে কেন, তোমার ফেরার জন্যই চিন্তা। আচ্ছা তাহলে বলছি, এরপর ১৫১৪ সালের ২০শে মার্চ অষ্টম হেনরী তাঁর প্রথম স্ত্রী আর্গনের ক্যাথেরিনকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

—উলসি কি তখন জমি ইজারা নিয়ে নিয়েছিলেন ?

—তখনও নেন নি, তবে তখন মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে ঐ জমিটি উনি নেবেন।

—কতদিন বাদে নিয়েছিলেন ?

—ঐ বছরেরই ২৪শে জুন তিনি খাজনা দিয়ে জমি দখল করেন। উলসির জমি পছন্দ করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে।

—কি সেই প্রবাদ ?

—লোকে বলে উলসি নাকি ইংলণ্ডের বড় বড় চিকিৎসককে দিয়ে লণ্ডনের ২০ মাইলের মধ্যে সব থেকে স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজে বার করিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই হ্যামটনের জলহাওয়ার প্রশংসা করেছিলেন।

—সেই সময় থেকেই নিশ্চয় প্রাসাদ তৈরীর কাজ সুরু হয়।

—প্রাসাদ সুরু হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। দক্ষিণ দিকে নিজের ঘর করালেন, তার নীচে বিশাল বাগান। ফুলের গন্ধ যখন ভেসে আসত তখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতেন। প্রাসাদ করা শেষ হলে লম্বা টানা বারান্দায় বৈকালিন ভ্রমণ করতে করতে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবতেন বোধ হয়।

—বাগান আর প্রাসাদ মিলিয়ে কতটা জমি আছে।

—সব মিলিয়ে ১৮০০ একর মত জমি রয়েছে।

—বিশাল ক্ষেত্র! বাগান কতগুলি আছে ?

—অনেক, প্রতি রানীর নামে বাগান যেমন—এ্যানবোলিন বাওয়ার, কুইন মেরীস বাওয়ার, তাছাড়া প্রিভি গার্ডেন, গ্রেট ফাউনটেন গার্ডেন…ইত্যাদি।

গ্রেট ফাউনটেন গার্ডেনে রয়েছে জিন রুজুর তৈরী লোহার ফটক। চল দেখিয়ে আনি।

মিঃ ডেলডারফিল্ডকে অনুসরণ করলাম।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর এলাম ফাউন্টেন গার্ডেনে। রট আয়রণের কাজ করা সুন্দর দুটি ফটক সত্যই আকর্ষণীয়। দুটির কাজই সুন্দর।

—এখন দুটি ফটক রয়েছে, ডেলডারফিল্ড সুরু করলেন। এখানে বারটি ফটক ছিল।

—সেগুলো কি নষ্ট হয়ে গেছে।

—না ঠিক নষ্ট হয়নি, তবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সেজন্যে খুলে সারিয়ে লণ্ডনের মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে।

—আরও বাগান আছে?

—হ্যাঁ, আস্ত গার্ডেন, টিলটিয়ার গার্ডেন, এছাড়া এখানকার বিখ্যাত কমলালেবুর চাষ আর দ্রাক্ষা কুঞ্জ। আর একটি আকর্ষণীয় জিনিষ হ্যামটন কোর্ট মাঝে ৬ ফিট উঁচু আর ২ ফিট ঘন হেজ দিয়ে ইংরাজী এ অক্ষরের মত করা হয়েছে।

—এ্যানবোলিনের জন্য নাকি?

—ঠিক ধরেছ। এ্যানের সময়েই এটি করা হয়েছিল। অবশ্য এখানকার অনেক বাগানই অষ্টম হেনরীর তৈরী।

—আপনি কমলালেবুর চাষের কথা কি যেন বলছিলেন?

—দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গনে তৃতীয় উইলিয়াম কমলালেবুর চাষ করেছিলে ১৫৭ ফিট লম্বা স্থান ওক কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘর তৈরী করে টবে কমলালেবুর গাছ লাগিয়েছিলেন। শীতের সময় ঐ টব ঘরে রাখতেন আর গ্রীষ্মে বাইরে বার করে দিতেন। লেবুর বাগানের একপাশে এ্যানেবোলিনস বাওয়ার। অপর দিকে ছোট্ট একটি বাগান, যার নাম টিউডার গার্ডেন।

—কমলালেবুর বাগানের কথা শুনে বেশ ভাল লাগল।

—আরও একটি কমলালেবুর চাষ ছিল।

—সেটি কে করিয়েছিলেন?

—রানী এ্যান। এর নাম লোয়ার অরেঞ্জারি।

—এবার দ্রাক্ষাকুঞ্জের কথা বলুন।

—পণ্ড গার্ডেনের ধারে একটি আঙুরের বীজ পোঁতা হয়েছিল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

তার প্রধান লতাটির দৈর্ঘ একশ ফিটের মত আর গোড়ার আশি ইঞ্চিরও বেশী হয়ে যায়। সুন্দর তারের মাচা করে লতাটিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হ্যামটন কোর্ট প্যালেসে সব থেকে বেশী থেকেছেন অষ্টম হেনরী তাই বললেন না?

—প্রথম চার্লসও অনেক দিন থেকেছেন। বেশীর ভাগ রাজা হিসাবে, পরে বন্দী হয়েও এখানেই ছিলেন।

—বন্দী হলেন কেন?

—গৃহযুদ্ধের জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রথম চার্লসের বিরোধের কথা।

—বেচারা চার্লসের জন্য দুঃখ হয়। মানুষ ভাল ছিলেন কিন্তু স্ত্রী ফ্রান্সের হেনরিয়েটা মারিয়ার ক্যাথলিক সাঙ্গপাঙ্গ পার্লামেন্টকে উত্তেজিত করতে লাগল। চার্লস শক্ত হাতে হাল ধরার চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবে শেষ রক্ষা হলো না।

—যুদ্ধ হয়েছিল, মোটামুটি ভাবে মধ্যবিত্ত সমাজ আর বণিকরা এসেছিল পার্লামেন্টের দিকে আর ধনী এবং কৃষক সম্প্রদায় গিয়েছিল রাজার পক্ষে তাই তো?

—ঠিক বলেছ। এই সময়ে পার্লামেন্টের পক্ষে অলিভার ক্রমওয়েল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। শেষ পর্যন্ত দু পক্ষের যুদ্ধ হলো। বন্দী হলেন চার্লস। ১৬৪৮ সালের ২৪শে আগষ্ট চার্লস হ্যামটন কোর্টে এলেন বন্দী হিসাবে।

—একদিন যেখানে ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সেখানেই থাকতে হলো বন্দী হয়ে! বড়ই বেদনাদায়ক।

—আমরা এতদিন বাদেও যা অনুভব করছি, তাঁর বেদনা নিশ্চয়ই অনেক গভীর ছিল। সেই বছরের ১১ই নভেম্বর ঝড় বাদলের রাতে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে নদী পথে পালিয়ে যান চার্লস।

—উনি ধরা দিয়েছিলেন তো?

—হ্যাঁ কিছুদিন ঘুরে ঘুরে শেষে স্কটদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

—বিচার হয়েছিল?

—১৩৫ জন বিচারক দিয়ে বিচার করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের কথা ৬৭ জন বিচারক তাঁর দিকে আর ৬৮ জন বিপক্ষে। অর্থাৎ মাত্র একটি ভোটে তাঁর শিরশ্ছেদ হলো।

—এরপর তো রাজা হলেন দ্বিতীয় চার্লস।

—সে তো অনেক দিন পর, প্রায় বার বছরের ব্যবধানে, এই সময় অলিভার ক্রমওয়েলের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। পার্লামেন্ট প্রথম চার্লসের সম্পত্তি এবং বহু প্রাসাদ বিক্রি করে দিয়েছিল কিন্তু হ্যামটন কোর্ট রেখে দেওয়া হয়েছিল অলিভার ক্রমওয়েলের ব্যবহারের জন্য।

রাজনীতির উত্থান পতনের পর দ্বিতীয় চার্লস এলেন এখানে। তাঁর প্রীতি হ্যামটন কোর্টের চেয়ে উইণ্ডসার ক্যাসেলের জন্যই ছিল। তবু তিনি তাঁর শিল্পী সুলভ দৃষ্টি দিয়ে এই প্রাসাদকে সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি প্রাসাদের পুব দিককার টিউডর পরিখা ভরাট করে সুন্দর বাগান তৈরী করিয়েছিলেন। দীর্ঘ রাস্তা আর তার ধারে গাছে বসান হয়েছিল তাঁরই কথা মত।

—তারপর কে হ্যামটন কোর্টে উন্নয়ন করেছিলেন?

—আগেই যা বলেছি। তৃতীয় উইলিয়াম, রানী মেরী রানী অ্যান ইত্যাদি সকলেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে।

এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম—মিঃ ডেলডারফিল্ড, না গেলে চলবে না, হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে ফিরে আসতে হবে।

—এলে খুশীই হব। বাকী কাহিনী শোনাতে পারব।

হেসে বললাম—দেখি, আপনাদের হ্যামটন কোর্ট আমাকে টেনে আনে কি না।

ফিরতে হয়নি, প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনের বাস পেয়ে গেলাম। বাসের দোতলায় উঠে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রইলাম মধ্যযুগের বিশাল প্রাসাদটির দিকে। কল্পনায় দেখতে পেলাম মুখর রাজবাড়ি। জানি না আর কোনদিন এখানে আসব কিনা। বাস চলতে সুরু করল, আর একটু পরেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল প্রাসাদ।

লিভারপুলে আলাপ হয়েছিল মিঃ বার্ড ব্লেজারের সঙ্গে। তিনি লর্ড পরিবারের ছেলে। বয়স ষাটের ওপর। বড় মধুর স্বভাবের। নানা নানা গল্প হতো একদিন বলেছিলাম—আপনাদের দেশে কিন্তু আমাদের দেশের মত অত প্রাচীন স্থাপত্য নেই।

উত্তরে তিনি বললেন—এ কথা আমি সমর্থন করি না। আমাদের দেশেও অনেক পুরাকীর্তি আছে তাকে প্রাচীন স্থাপত্য বলা চলে।

—নিশ্চয়ই আছে, তবে অধিকাংশই মধ্যযুগের।

—মধ্যযুগে যে আমাদের উন্নতি হয়েছিল দ্রুতভাবে। তাই ইউরোপের আনাচে কানাচে দেখবে মধ্যযুগের প্রাসাদ। সবগুলিই যে বড় তা নয় অনেক ছোট ছোট প্রাসাদও আছে।

—আমি তো শুনে এসেছি এই সব প্রাসাদে অশরীরিদের আনাগোনা চলে।

—কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়, সব প্রাসাদের কথা তো আমি জানি না। তবে অমন গল্প থাকা অসম্ভবও নয়।

—এমনি কোন প্রাসাদ কখনও দেখেছেন ?

হেসে মিঃ ব্লেজার বললেন—একবারের একটা অভিজ্ঞতা আছে…তবে তোমার কেমন লাগবে জানি না।

উৎসাহিত হয়ে বলি—আগে বলুন কি দেখেছেন, তবে তো বুঝব কেমন লাগছে।

মিঃ ব্লেজার হেসে বললেন—ঠিক আছে স্বরু করছি। তুমি তো জান আমাদের পূর্ব পুরুষরা আর্ল মানে জমিদার শ্রেণীর ছিলেন। আমার মামার বাড়ী কলউইনে। তাঁরা সেখানকার আর্ল। যা হক একবার মার্চ মাসে মামাদের বাড়ি কোন একটা উৎসব উপলক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। জায়গাটি বড় মনোরম, সমুদ্রের কাছে। ঠিক করলাম যাব। বেরিয়ে পড়লাম।

যখন বেরলাম তখন আকাশ পরিষ্কার। তারপরেই ক্রমে ক্রমে মেঘ জমতে লাগল। একটু পরে বৃষ্টি বেশ চেপে এলো। তবু সাবধানে গাড়ী চালালাম। কনওয়ের কাছে এসে মটর বিগড়ে গেল। একে বৃষ্টি তাতে রাত বেশ গভীর

হয়েছে, চেষ্টা করেও কোন মেকানিক্ যোগাড় করতে পারলাম না। কি করব ভাবছি, ক্ষিদেও পেয়েছে জোর।

কাছে পিঠে কোথাও কোন খাবার দোকান বা রেষ্টুরেণ্ট জাতীয় কিছু চোখে পড়ল না। তেমন কোন লোকও দেখলাম না যাকে সাহায্য করতে বলতে পারি।

অন্ধকার, বৃষ্টি ঝরা রাতে অচেনা জায়গায় যখন আমি বলতে গেলে অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি ঠিক তখনই প্রায় আমার গাড়ির পাশ থেকে একটি মনুষ্য অবয়ব বেরিয়ে এলো। সত্যি বলতে কি আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মূর্তিটি ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলো। বলাই বাহুল্য বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার জন্যে আমি জানলার কাঁচ তুলেই বসেছিলাম। সে দস্তানা পরা হাত ওভার-কোটের পকেট থেকে বার করে কাঁচের ওপর টোকা দিল। গাড়ীর মধ্যে আলো জ্বলছিল সেই আলো মূর্তির গলা পর্য্যন্ত পড়েছিল তাই মানুষটিকে ঠাওর করতে পারছিলাম না ঠিক ভাবে।

যা হক কাঁচ নামালাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা নারীর খসখসে স্বর ভেসে এলো—শহরতলির ধারে, ভর সন্ধ্যায় গাড়ী বন্ধ করে বসে আছ কেন? গাড়ী খারাপ না কোন বদ মতলব আছে?

একে চিন্তা, তাতে গাড়ী খারাপ, তারপর যদি গা-জ্বালান এমন কথা শোনা যায় তবে কার আর মাথার ঠিক থাকে? আমিও খিঁচিয়ে বললাম—শহরের শেষ প্রান্তে, বিনা অস্ত্রে কি কেউ বদ মতলবে বসে থাকে?

—তবে কি হাওয়া খাচ্ছ?

রাগ বেড়ে গেল—হ্যাঁ এমন জ্যোৎস্না রাতে হাওয়া খাব না তো কি করব? তাতে কি তোমার আপত্তি আছে? তুমি কি এখানকার 'ব্যারনেস' নাকি যে তোমার হুকুম মানতে হবে?

—আমি আর ব্যারনেস কি করে হব, সে সব তো কবে চুকেবুকে গেছে, তবে ছিল, আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্যারণই ছিল।

গলায় করুণ ভাব।

অবশ্য তখন আমার কিছু ভাল লাগছিল না তাই বললাম—ভাল কথা। তোমার পরিচয় জানার আগ্রহ আমার বিন্দুমাত্র নেই, তুমি যেতে পার।

—যাব তো নিশ্চয়ই তবে তোমাকে দেখে স্থানীয় বাসিন্দা বলে মনে হলো না, ভাবলাম যদি কোন সাহায্য লাগে।

বৃদ্ধার গলায় তখন স্নেহের আভাস ফুটে উঠেছে। ' আর আমারও তখন একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় ভীষণ দরকার। তাই বললাম—সাহায্য করলে তো ভালই হয়।

—কি সাহায্য চাই বল না।

—রাত কাটাবার একটা জায়গা আর কিছু খাবার।

কথাটা শুনে বৃদ্ধা কি ভাবল, তারপর বলল—খাবার জিনিষ না হয় আমার বাড়ি থেকেই এনে দেব, তবে থাকতে কোথায় দেব··· মহামুস্কিল ···।

হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় উল্লসিত হয়ে উঠে বলল—তোমার সাহস আছে তো?

—একথার অর্থ? বাঘের খাঁচায় শুতে হবে নাকি?

—না, না, তা নয়। এখানে মধ্য যুগের একটা প্রাসাদ আছে, তার চাবি থাঁকে আমার কাছে। যদি চাও তো দু চার রাত তোমাকে ওখানে থাকতে দিতে পারি।

—দু চার রাত থেকে আর কাজ নেই, শুধু আজকের রাতটা কাটাতে পারলেই হলো।

—ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।

আমি গাড়ী থেকে নেমে মহিলাকে অনুসরণ করলাম। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। মনে হলো সমুদ্রের দিকে বা কোন জলের দিকে যাচ্ছি। একটু পরে ডানদিকে বেঁকতেই দূরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়া ছায়া প্রাসাদ চোখে পড়ল। পথের আলোও বিরল হয়ে এসেছে।

—এই প্রাসাদের কথাই বলছিলাম।

মহিলার খনখনে স্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এ যে ভূতুড়ে বাড়ী, দ্বার নেই, আগল নেই, এখানে কি মানুষ থাকে?

ভূতুড়ে হতে যাবে কেন! দুষ্টু লোকেরা রটনা করে।

—যা রটে তার কিছুটাও তো বটে!

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ কোন উত্তর করল না, তার পর বলল—যদি থাকে তাতে তোমার কি? তোমার সঙ্গে তো তাদের কোন শত্রুতা নেই।

—তাই বলে ভূতের বাড়ীতে থাকব!

—সেইজন্যেই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহস আছে তো?

পৌরুষে আঘাত লেগে গেল, বললাম—সাহস, অসাহসের প্রশ্ন নয়, শান্তি অশান্তির প্রশ্ন। যাক্ চল দেখি তোমার প্রাসাদ কেমন।

কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় প্রদক্ষিণ করে প্রাসাদের বিপরীত দিকে এসে পড়েছি। সামনেই সমুদ্র।

বৃদ্ধা নিজের ব্যাগ থেকে বেশ জোরাল একটা টর্চ বাব করে জ্বালল। তখন দেখলাম সামনেই কয়েকটি সিঁড়ি রয়েছে। মহিলা উঠতে লাগলেন।

আমি অনুসরণ করলাম।

চার পাঁচটি সিঁড়ি ওঠার পব একটি বন্ধ দরজার সামনে এলাম। আমার সঙ্গিনী এবার ব্যাগ হাতড়ে চাবির গোছা বার করলেন, তারপর টর্চের আলোয় চাবি পরীক্ষা করে দরজার গায়ে লাগান তালা খুললেন, সঙ্গে সঙ্গে কপাটটা এমন ভাবে খুলে গেল যেন মনে হলো কেউ ভিতর থেকে টেনে খুলে দিল।

দরজা পেরিয়ে পড়লাম লম্বা বারান্দায়। আমাদের পায়ের শব্দে পায়রা*বা অন্য কোন পাখী হঠাৎ পাখা ঝাপটে উঠল।

ঢাকা বারান্দার শেষে বাঁদিকে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। বৃদ্ধা উঠলেন, সঙ্গে আমি।

দোতলায় সিঁড়ির শেষে একটি দরজা। নীচের দরজার সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। এই দরজাটির বয়স কম করেও পাঁচশ বছর হবে। নীচেরটি ছিল হাল আমলের।

মহিলা চাবি লাগিয়ে তালা খুললেন। এবার কিন্তু দরজাটা খুলে গেল না। বৃদ্ধা বার দুই তিন ধাক্কা দিলেন কিন্তু খুলল না। অগত্যা আমার শরণ নিলেন। আমি চেষ্টা করলাম, বেশ জোর দিলাম কিন্তু ফল হলো না। বললাম—ভিতর থেকে বন্ধ নয় তো?

—না, না ভিতর থেকে বন্ধ হবে কি করে?

—কেন তুমি যে বলেছিলে আগল আছে।

—তা তো আছেই কিন্তু ভিতরে কেউ থাকবে তবে না আগল দেবে।

—সে কথা তো ঠিক।

এবার আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে অনিচ্ছা সত্বে যেন দরজাটা একটু ফাঁক হলো।

এবার বৃদ্ধা হাত লাগলেন, সঙ্গে আমিও।

দরজা খুলল।

মনে হলো সামনে বারান্দা।

ঢুকলাম। অনুমান ঠিকই।

বারান্দার ধারে ধারে অনেকগুলো দরজা, মনে হলো ঐ দরজার পিছনে ঘর আছে। সেগুলো অবশ্য সবই বন্ধ।

বাঁদিকের শেষ প্রান্তে একটা দরজার কাছে এসে মহিলা থামলেন।

আবার চাবি খোলা হলো।

ঢুকলাম।

টর্চের আলোতে যতটুকু দেখলাম তাতে বুঝতে বাকী রইল না ঘর বেশ প্রশস্থ এবং সুসজ্জিত।

অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজে আন্দাজে মহিলা বেশ তৎপরতার সঙ্গে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর পালঙ্কের বিছানাটি ঝেড়ে দিয়ে বললেন—তুমি এখানে বিশ্রাম করে, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

ঐ বিশাল অন্ধকার ভাঙ্গা প্রাসাদে একা থাকতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও করছিল না, নেহাৎ ভয় প্রকাশ করতে লজ্জা হচ্ছিল তাই। তবু বললাম—এই অন্ধকার রাতে আবার কোথায় খাবার আনতে যাবে, আমার ক্ষিদে নেই। তুমি বরং খাটে শুয়ে পড় আর আমি ঐ আরাম চেয়ারে বসে রাতটা কাটিয়ে দিই।

বুড়ী হঠাৎ কেমন বিশ্রী ভাবে হেসে উঠে বললেন—ভয় পেয়েছ তো?

মহিলার ব্যাঙ্গ শুনে মাথা গরম হয়ে গেল, বললাম—মোটেই নয়, শুধু তোমার কষ্ট হবে বলে।

তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠে বললেন—কিছু কষ্ট হবে না, তুমি সাবধানে থেকো, এখানে অনেক দুষ্টু লোক আছে, তারা হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে পড়ে পুরানো জিনিষ চুরি করার লোভে। আচ্ছা চলি।

বৃদ্ধা নেমে গেলেন।

যতক্ষণ তাঁর জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ততক্ষণ কিছু মনে হয়নি। তারপরই কেমন অসহায় মনে হতে লাগল।

চিন্তার ধারা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। তখন মনে পড়ল আমার পকেটেও একটা ছোট টর্চ লাইট আছে। আমি আলো ফেলে ফেলে সব দেখতে লাগলাম। যদিও মোমবাতি জ্বলছিল তবুও অতবড় ঘরটা অন্ধকারই মনে হচ্ছিল।

ফায়ার প্লেসের ওপর একটা ছবি দেখলাম, এবং রানীর। মুখটা চেনা

চেনা মনে হলো। একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ল, আরে এতো তৃতীয় এডওয়ার্ড আর রানী ফিলিপ্পার ছবি !

মন দিয়ে যখন ছবিটা দেখছি তখনই কানে এলো দোতলার দরজার পরিচিত অনিচ্ছুক ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ।

সতর্ক হয়ে উঠি, নিশ্চয় কোন দুষ্টু লোক। খস্‌খস্‌ শব্দ বারান্দা দিয়ে ক্রমশঃ এই ঘরের দিকে এগোতে থাকে।

দরজার দিকে তাকাই। ভেজান রয়েছে। ভাবলাম গিয়ে খিল বা ছিটকিনী যা আছে সেটা লাগিয়ে দিই। কিন্তু আমার পায়ে যেন কে স্ক্রু দিয়ে মেঝের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছে, নড়বার ক্ষমতাও নেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে যেতে লাগল, আমি স্ট্যাচুর মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সে দিকে তাকিয়ে—একবার মনে হলো লেসের ঝালর লাগান জামা পরা কোন মহিলার হাত পলকের জন্য দরজায় রেখে সরিয়ে নিল। তারপরই ঢুকল একটি কাল বিড়াল।

ঢুকল কিন্তু সম্পূর্ণ দেহটা নিয়ে নয়, অর্দ্ধেকটা তারপর জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে আমাকে যেন জরিপ করতে লাগল।

জীবটা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন কোন যাদুকর সম্মোহন করছে। আমি মুখে একটা শব্দও বার করতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দুবার মিয়াও মিয়াও করে ডেকে ঠিক মানুষের মত ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে উঠল।

মনে হলো পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে, বিড়াল হাসছে !

পড়ে যাবার আগের মুহূর্তেই বলতে গেলে আবার দরজার সেই শব্দ হলো, আর বুড়ী সোরগোল তুলে এগিয়ে আসতে লাগল। অল্প সময়ের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, পরেই বিড়ালটিকে দেখার জন্যে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই।

ইতিমধ্যে বুড়ী এসে পড়ল। বলল—সামান্যই খাবার এনেছি, দেখ পেট ভরে নাকি।

খাবার ইচ্ছে যে কখন চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। মহিলাকে দেখে মনে যেন জোর ফিরে এলো। চিন্তা, ভাবনা আবার যে যার স্থান নিয়ে নিল। প্রশ্ন করলাম—এ বাড়ীতে কারা বিড়াল পোষে ?

—এ বাড়ীতে কেউ নেই, যে বিড়াল পুষবে।

—তবে যে দেখলাম।

—ওসব মনের ভুল। এখন খেয়ে নাও।

বুড়ী অতটুকু সময়ের মধ্যে মোটামুটি ভালই খাবার এনেছিল। খেয়ে নিলাম।

খাওয়া শেষ হতে বিনীত ভাবেই প্রশ্ন করলাম—কত দাম ?

—দাম ! দাম কি হবে ?

বুড়ী যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতীতেব দিন হলে এই প্রাসাদে এলে তোমার কত আদর হতো, আর আজ··যাক সে কথা। এবার আমি চলি। কাল ভোরে আবার আসব।

—তুমি চলে যাবে ?

বুড়ী স্নেহের হাসি হেসে বলল—না গেলে চলবে না. তাই যাচ্ছি। আর আমার বাড়ীতেও জায়গা নেই যে থাকতে বলব। আচ্ছা চলি।

মহিলা তো চলে গেলেন।

বাধ্য হয়ে মনে সাহস সঞ্চার করে বিছানায় শুযে পডলাম। অবশ্য তার আগে দরজা, জানলা সব বন্ধ কবে দিলাম। জানলার ছিটকানিগুলো তেমন জোরদার ছিল না। যা হক যথা সম্ভব ভালভাবে বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। এক সময় কার ধাক্কায় যেন ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম বুড়ী ডাকছে। তাকিয়ে দেখে চমকে গেলাম, বুড়ী কোথায় ? বিশাল লম্বা চওড়া এক পুরুষ মানুষ।

অচেনা মানুষটিকে দেখে এমনি ঘাবড়ে গেলাম যে গলা দিয়ে কোন স্বর বার করতে পারলাম না।

লোকটিও যেন বোবা, তর্জনী দিয়ে উঠে পড়তে ইশারা করল। আমি তবুও উঠলাম না। ইচ্ছা করে নয়, ভয়ে।

এবার মূক বাচাল হলো। গর্জে উঠল—ওঠো। এখনই ইসাবেলা এসে পড়বে।

এতক্ষণে আমার শক্তি ফিরে এসেছে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে ?

সে যেন মজার কথা শুনল এমন করে হাসল—আমাকে চেন না ! চেনার দরকার নেই, এবার যাও। ইসাবেলা এসে পড়বে, এখনই তার পিয়ানো বাজান হয়ে যাবে।

তার কথা শেষ হতে শুনতে পেলাম পিয়ানোর মিষ্টি আওয়াজ।

এমন সুমধুর সুর আমি আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ল না। সে যেন' আকর্ষণী শক্তি দিয়ে আমায় টানতে লাগল। শরীরে বল ফিরে আসতে লাগল।

ঘরের ডান দিকে যে একটা দরজার খিলান পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল তা আমি আগে দেখিনি। গানের সুর আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পাশের ঘরটিও সুন্দর সাজান। পিয়ানোর কাছে কাউকে দেখতে পেলাম না, অথচ সুন্দর বাজনা বেজে চলেছে। আশ্চর্য!

আমি পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা ঘুরে গেল, মানুষ কোথায়? শুধু একটা হাত বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

কি খুব অবাক লাগছে? পাশেই দেখি সেই বিছানার ধারের মানুষটি। হেসে বলল—এ হচ্ছে আমার ইসাবেলার হাত! সঙ্গে সঙ্গে হাতটি যেন উড়ে লোকটির হাতে চলে এলো।

আমার আর কিছু মনে নেই। যখন সব বুঝতে পারলাম তখন দেখলাম আমার মাথার কাছে বসে আছে রাতে দেখা সেই বৃদ্ধা মহিলা।

আমাকে তাকাতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যাক্, তোমার জ্ঞান ফিরেছে, আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম।

আমার ভীষণ রাগ হলো বললাম—সবই যখন জান তখন কেন পাঠালে, আমি যা হক করে গাড়ীতেই রাতটা কাটিয়ে দিতাম।

ঐ জন্যেই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার সাহস আছে কি না।

—একি বাঘের সঙ্গে লড়াই যে বিক্রমের দরকার? অশরীরির সঙ্গে কি কেউ যুদ্ধে পেরে ওঠে? না যুদ্ধ করা যায়।

—শারীরিক শক্তি নয় মনোবল আছে কি না সেটাই জানতে চাইছিলাম।

—যাক্ ও কথা, বল তো এ কাদের আত্মা?

—তোমার মুখে ঘটনা আর নাম শুনে মনে হয় দ্বিতীয় রিচার্ডের।

—দ্বিতীয় রিচার্ড? সে তো বহুদিন আগের ঘটনা। মারাই গেছেন ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে।

—মারা যাননি, হত্যা করা হয়েছিল।

—যাই হক, সেই আত্মা এতদিন পরে!

—আত্মার কি বয়স আছে? শোন ঘটনা তা হলেই বুঝবে।

—বলুন।

—এই ছোট্ট প্রাসাদটি করিয়েছিলেন তৃতীয় এডওয়ার্ড। জান নিশ্চয়ই তিনি দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেছিলেন—পঞ্চাশ বছর। সেই সময় সে সব গঠনমূলক কাজ করেছিলেন তার মধ্যে প্রাসাদ সংস্কার বা প্রাসাদ তৈরীর কাজও একটি।

প্রাসাদটির প্রতি তৃতীয় এডওয়ার্ডের মমত্ব ছিল এবং মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেনও তিনি। তবে তাঁর পুত্র ব্ল্যাকপ্রিন্সের প্রাসাদের উপর আকর্ষণ ছিল খুব। অবশ্য তাঁর রাজা হবার সুযোগ হয়নি। রাজা হলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড।

চরিত্রের অনেক রকম দোষ নিয়ে তৈরী হলো দ্বিতীয় রিচার্ড। তার মধ্যেই যে কয়েকটি গুণ ছিল, সেগুলির মধ্যে শিল্পী সুলভ মনোভাব এবং প্রকৃতি প্রেম প্রধান।

এইসব গুণের জন্যেই বোধহয় সে এখানকার প্রাসাদটিকে ভালবাসত।

আমি অধৈর্য হয়ে বলি ভালবাসার সঙ্গে এখানে অশরীরি ভাবে ঘুরে বেড়ানর সম্পর্ক কি ?

—আছে, বলছি। তুমি তো জান তৃতীয় এডওয়ার্ড মারা যাবার পরই তাঁর এগারটি ছেলেমেয়েদের থেকে আত্মীয় বিরোধ দিয়ে সুরু হলো দুই গোলাপের যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের প্রথম বলি দ্বিতীয় রিচার্ড। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। দুবার বিয়ে করেছিল, দ্বিতীয়া স্ত্রী ফ্রান্সের ইসাবেলাকে রিচার্ড ভালবাসতো। কারণ সে ছিল গুণী।

—এইজন্যে আজও পর্য্যন্ত ঘুরছে তার আত্মা ?—আমি হাসলাম।

—হেসো না। ইসাবেলাকে বিয়ে করার কদিন পরেই বা তার মৃত্যু হলো বল ? অতৃপ্তিই তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনছে। একবার সে কথা বিবেচনা কর।

—মেনে নিলাম সে কথা। কিন্তু তার আত্মা ছোট্ট এই প্রাসাদের আনাচে কানাচেই বা ঘুরছে কেন ? লণ্ডনে বা অন্য বড় প্রাসাদে তার আত্মা যায় না কেন ?

—এখানে আসে এইজন্যে যে ও এখানে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছিল, এই প্রাসাদটিকে ভালবেসেছিল, বোধ হয় তাই।

—শরীর একটু সুস্থ হতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দিনের আলোয় একবার দেখেছিলাম প্রাসাদটিকে। সত্যিই বড় আকর্ষণীয়, হয়তো তাই আত্মারা

ঘুরে বেড়ায় এর চারিধারে। তারপর বৃদ্ধাকে বিদায় জানিয়ে চলে এসে-ছিলাম।

গল্প শেষ করে মিঃ ব্লেজার জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেমন লাগল ?

—চমৎকার। আর কিছু জানেন না।

—জানি, পরে বলব।

ওয়ারউইক ক্যাসল পর্ব

শেক্সপিয়ারের বাড়ী দেখাব জন্য গিয়েছিলাম এ্যাভন নদীর ধারে। সঙ্গে আর একটি উদ্দেশ্য মধ্যযুগীয় প্রাসাদ ওয়ারউইক ক্যাসেল আর কেনিল ওয়ার্থ ক্যাসেল দেখা।

মধ্যযুগে ইংলণ্ডের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন 'আর্লরা'। এই প্রাসাদগুলি তাঁদেরই অবদান।

আমরা প্রথমেই গেলাম ওয়ারউইক ক্যাসেলে। প্রাসাদে ঢোকার আগে বাগানে ঘুরলাম। নদীর ধারে বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে বাগান তার মধ্যে আবার গোলাপের বাগান চিরদিন মনে রাখার মত। সাজান বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ময়ুর। একজায়গায় লেখা রয়েছে পিকক গার্ডেনস। বাগান দেখেই মুগ্ধ, প্রাসাদের কথা ভুলেই গেছি। একদিকে দেখি রডড্রেনডনের সার। সে কী রংএর বাহার। পাশে লেখা রডড্রেনডন ওয়াক। এ্যাভন নদীর জলও কত স্বচ্ছ, নীল, যদিও সংকীর্ণ।

ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল ক্যাফেটেরিয়া। নামটা দেখেই বোধহয় চা-পিপাসা বোধ হলো। গিয়ে বসলাম, তখনই মনে পড়ল এখানে তো সেলফ্ ব্যাপার। তাই উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম চা।

আমরা যে টেবিলটি দখল করে বসেছিলাম তার অদূরে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমরা চা খাচ্ছি তখন তিনি উঠে পড়লেন, চলে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে আমাদের টেবিলের কাছে এলেন, তারপর বললেন—কিছু মনে করো না একটা প্রশ্ন করছি।

—না, না, মনে করব কেন, বলুন না কি জানতে চান।

—তোমরা তো ভারতীয়, তাই না?

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, আমরা ভারতবাসী।

—আচ্ছা, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ কি শেক্সপিয়ারের মত নাটক লিখেছেন?

—দেখুন, আমার তো মনে হয় কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা না করাই ভাল, যে যাঁর ক্ষেত্রে তাঁর মত।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা হলো। তিনি বসলেন, চা খেলেন।

প্রশ্ন করলাম—এখানে ভাল গাইড পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, তারা ঘুরিয়ে দেবে। তার আগে আমি তোমাদের এখানকার ইতিহাস বলব। জানি না তোমরা এই প্রাসাদ সম্বন্ধে কতটা কি জান।

—আমরা খুব সামান্যই জানি। আপনি বলুন না জানতে পারব প্রাসাদটির সম্বন্ধে।

—দাঁড়াও ভেবে নিচ্ছি কোথা থেকে সুরু করব।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এতক্ষণ কথা বলছি অথচ ভদ্রলোকের নামটাও জানা হয়নি। তাকিয়ে ভাল করে দেখলাম, আধা বয়সী ভদ্রলোক, সৌম্য, সম্ভ্রান্ত চেহারা।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

মানুষটি একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—এখন শুধু নামটাই আছে, ক্ষমতা কিছুই নেই, না হলে আজ কি আমাকে এভাবে এই কাফেতে দেখতে পেতে। সে যাক আমার নাম এডওয়ার্ড গ্রেভিল।

নামটি শুনে মনে হলো চেনা চেনা। একটু পরেই মনে পড়ল ওয়ারউইক ক্যাসেল সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে এই ধরনের নাম পেয়েছি। তবে কি এই ভদ্রলোক তাঁদেরই কেউ?

কৌতূহল চাপতে পারলাম না, বললাম যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা প্রশ্ন করব।

—নিশ্চয়ই, মনে করার কিছু নেই।

—আচ্ছা, যে, গ্রেভিল পরিবার এই প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আপনি কি তাঁদের কেউ?

—ঠিক ধরেছ, আমি তাঁদেরই বংশধর···জমিহীন জমিদার···আর কি।

আমার এইটুকু ক্ষমতা আছে, যে এই প্রাসাদে থাকতে পারি। যেমন এখান থেকে পাঁচ-ছ কিলোমিটার দূরে কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেলে ডুডলে পরিবার থাকতে পারে।

—এবার ইতিহাসটা বলুন শুনি।

—প্রাসাদটির অধিকাংশই স্থানীয় আর্লদের তৈরী। তবে এটির জন্ম অনেক আগে। বলতে গেলে সেই এ্যাঙ্গলো স্যাকসানদের সময় থেকে। ডেনেদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য আলফ্রেড দি গ্রেটের মেয়ে এথেলফ্লেডা ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গের পত্তন করেন। তখন ছিল মাটির পাহাড় আর কাঠের প্রাচীর। মাটির পাহাড় এখনও রয়েছে, দেখেছ বোধহয়।

—না, এখনও কিছুই দেখিনি।

মিঃ গ্রেভিল কাফেটেরিয়ার জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঐ উঁচু মত ওটাই পাহাড় মানে টিলা আর কি। নাম এথেলফ্লেডাস মাউন্ট। এই দুর্গ প্রাচীর রক্ষার ভার ছিল রানীর বিশ্বাস ভাজন ধনী সম্প্রদায়ের ওপর। বলতে গেলে সেই সময় থেকে আর্ল প্রথার জন্ম।

—তারপর, এর বর্তমান রূপ কে দিলেন?

—কোন একজন করেননি, অনেকের অবদান আছে। আর্লদের মধ্যে ওয়ারউইকের একজন স্যাকসন আর্ল খুব বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল গাই। নাম ঠিক নয়, উপাধি পেয়েছিলেন তাঁর বীরত্বের জন্য। সেই যুগে তিনি হিংস্র পশু, ড্রাগন ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন। শুধু উপাধি নয় তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত স্যাকসন আর্ল রোহণ্ডের কন্যার সঙ্গে গাই এর বিয়েও হয়।

গাই এর এত ভাল বিয়ে হবার পর সকলে আশা করছিলেন তিনি এবার শান্তিতে জীবন যাপন করবেন। কিন্তু গাইএর মধ্যে রোমাঞ্চকর কিছু করার ইচ্ছা সব সময় থাকত, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তিনি ভালবাসতেন না। যখন বয়স বেশী হলো তখন তিনি তীর্থ করতে গেলেন। পথে একজন দৈত্য বাধা দিলে তাকে হত্যা করলেন। তীর্থ সেরে ওয়ারউইকে ফিরে এসেও অজ্ঞাতবাসে রইলেন। নিজের প্রত্যাবর্তনের খবর স্ত্রীকেও জানাননি। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত গোপনে গাই পর্বতে গুহায় কাটিয়েছিলেন।

এই পর্য্যন্ত বলে মিঃ গ্রেভিল একটু থামলেন, তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন —আসল কাহিনী যে কি তা এখন জানা যায় না, রূপকথার কাহিনীই প্রায় সত্যের মত হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘুরছে।

—প্রাসাদ গড়ার কাজ কবে থেকে সুরু হলো ?

—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ থেকে এই প্রাসাদের কাজ ভালভাবে সুরু হলো। যখন হেনরী ডি নিউবার্গ নামে একজন এখানকার আর্ল হলেন, তখন থেকে সুরু হলো এর আসল কাজ। কাঠের দেওয়ালের বদলে পাথরের দেওয়াল বসান হলো। অনেকগুলি টাওয়ার তৈরী হলো। কিন্তু এই প্রাসাদ স্থায়ী হতে পারল না কারণ তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে ছিলে তৃতীয় হেনরী। তাঁর দুর্বলতায় সুযোগ নিয়ে তাঁর আত্মীয় সাইম ডি মণ্টফোর্ড ওয়ারউইক ক্যাসেল আক্রমণ করেন এবং প্রায় ধ্বংস করেন। সে সময় এখানকার আর্ল ছিলেন কেনিল ওয়ার্থে। সেখানেই তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করা হয়। পরে অনেক টাকার বিনিময়ে তাঁরা মুক্তি পেলেও বেশী দিন বাঁচেননি।

নিশ্চয় তারপর অন্য কেউ এটির ভার নিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, এরপর বুচেম পরিবারের হাতে আসে এই প্রাসাদটি। তাঁদের অবদান রয়েছে এখানে। চতুর্দশ শতাব্দীর স্থাপত্যের বিশিষ্ট উদাহরণ এই প্রাসাদের টাওয়ারগুলি, তার মধ্যে সীজারস টাওয়ার গাই টাওয়ার বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রাসাদটিকে সংরক্ষিত করার জন্য পরিখা খনন এবং সুদৃঢ় পাথরের গড় তৈরী করিয়েছিলেন। এই পরিবারের প্রথম যিনি প্রাসাদের জন্য কাজ করান তাঁর নাম টমাস বুচেম। সীজার টাওয়ার প্রধানতঃ রাজ বন্দীদের থাকার জন্যই ব্যবহার করা হতো। ঐ সব বন্দীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হতো তা ভাবলে আজও আমাদের ভয় হয়। আর তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না আজও ঐ সীজার টাওয়ারে, গাই টাওয়ারে অশরীরির আনা-গোনা চলে।

যে প্রশ্নটা করব ভেবেও করতে কুণ্ঠাবোধ করছিলাম সেই প্রসঙ্গ এসে পড়াতে আমি অত্যুৎসাহি হয়ে প্রশ্ন করি—কি হয় ? কারুর কিছু ক্ষতি করে ?

—না, না, তবে অনেকেই দেখে, কথা শোনে।

—আমাদের বলবেন, শুনতে খুব আগ্রহ হচ্ছে।

—বলব। আসল কাহিনী না জানলে তো বুঝতে পারবে না, বলব, কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই বলব।···যা বলছিলাম, সীজার টাওয়ার পুরোপুরি পাথরের ওপর তৈরী। প্রায় ১৪৭ ফিট উঁচু সব মিলিয়ে। ধারে পরিখা দেওয়া হয়েছিল এটিকে দৃঢ় করার জন্য।

টমাস বুধামের ছেলেরও নাম টমাস। তিনি গাই টাওয়ারটি করান। এটি

শেষ হয়েছিল ১৬৯৪ সালে। তখনকার যুগে খরচ পড়েছিল ৩৯৫ পাউণ্ড। এর উচ্চতা ১২৮ ফিট। দেওয়ালের ঘনত্ব ১০ ফিট। বিশিষ্ট পাঁচতলা এই গম্বুজটি মনে ভয় মেশান বিস্ময় জাগায়। এর নাম গাই টাওয়ার হবার এক ইতিহাস আছে। আর তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অশরীরির উপস্থিতির ঘটনা।

—বলুন, কি ব্যাপার।

—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্যারণদের ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের অসন্তোষ ছিল রাজার বিরুদ্ধে। কোনটা উচিত বা কোনটা অনুচিত সে বিচারের মধ্যে যাচ্ছি না, শুধু ঘটনাটাই বলছি। প্রথম এডওয়ার্ড যখন রাজা তখন তাঁর ছেলে দ্বিতীয় এডওয়ার্ড তাঁর বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুবই মাতামাতি সুরু করল। তার মধ্যে ছিল দুজন—পিয়ারস গাভেস্টোন আর ডেলপেন্সার। প্রথম এডওয়ার্ড তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাভেস্টোনকে ফিরিয়ে আনলেন। এতদিনের অদর্শন পুষিয়ে নিতে চাইলেন দুজনে। এর মধ্যে আরও একটি ব্যাপার ছিল যেটা ব্যারণদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয় এডওয়ার্ড বিয়ে করেছিলেন ফ্রান্সের রাজকন্যা ইসাবেলাকে। তারই প্রভাবে ইংলণ্ডের রাজ-দরবারে তাদের প্রাধান্য বাড়তে লাগল। গাভেস্টোন রাজানুগ্রহ পাওয়ার ফলে তার মনে আত্মশ্লাঘা জন্মাল। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যারণদের কারণে অকারণে অপমান করতে লাগল। ব্যারণদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তাঁকে সকলে ডাকত গাই বলে। গাভেস্টোন আড়ালে তাঁকে ব্যাঙ্গ করে বলত শিকারী কুকুর।

কথাটা গাই এর কানে পৌছে ছিল। শুনে তিনি বলেছিলেন—ঠিক কথা, শিকারী কুকুর। কিন্তু ঐ কুকুর যখন কামড়াবে তখন বুঝবে।

গাভেস্টোনের প্রতিপত্তি বেশীদিন স্থায়ী হলো না। ওয়ারউইকের আর্লরা এবং অন্যান্য প্রধানরা রাজার উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন, ফলে এডওয়ার্ডকে বাধ্য হয়ে গাভেস্টোনকে আবার নির্বাসনে পাঠাতে হলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই এডওয়ার্ড মন স্থির করলেন গাভেস্টোনকে ফিরিয়ে আনবেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহিত করলেন। গাভেস্টোন ফিরে এলেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্লরা তাকে স্কারবরো ক্যাসেলে বন্দী করলেন।

তারপর আনা হলো ওয়ারউইকে। এখানে এই প্রাসাদের বড় ঘরে বিচারের একটা প্রহসন হয়েছিল, তাতে গাভেস্টোনের শাস্তি হলো শিরশ্ছেদ।

গাই প্রমাণ করলেন তিনি কামড়াতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, গাই তাঁর বিজয় বেশী দিন ভোগ করতে পারলেন না, রহস্যজনক মনোভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

—রহস্যজনক অর্থে কি ভৌতিক কিছু বলছেন নাকি ?

—না, না, ভৌতিক নয়। শোনা যায় গাভেস্টোনের কয়েকজন প্রেমিকা ছল। তার মধ্যে উডভিল নামে একজন সঙ্গিনী তার প্রেমিকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে ছিল গাইকে হত্যা করে। উডভিলের প্রতি গাইএর হয়তো দুর্বলতা জন্মে ছিল, সে সেটিকে কাজে লাগায় পানীয় দেবার সময় তাতে বিষ দিয়ে।

—আপনি যে বললেন, এই সঙ্গে কি এক অশরীরির কাহিনী আছে।

—লোক বলে এবং বিশ্বাস করে। টাওয়ারে যখন ঢুকবে তখন গাইডও সে কথা বলবে। যা হ'ক অনেকেই দেখেছে সীজার টাওয়ারে একজন শৃঙ্খলিত বন্দী নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। তার পাশে এক সুন্দরী রমণী দাঁড়িয়ে। কেউ শুনেছে মানুষটি বলছে—একবার যদি ছাড়া পাই তবে ঐ শিকারী কুকুরটাকে চাবুক মেরে শেষ করব। কেউ শুনেছে নারী বলছে, আমি ছাড়ব না, প্রতিশোধ নেবই।

—ওয়ারউইকদের অনেকে তো ইংলণ্ডের রাজদরবারে বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

—ঠিক কথা। রিচার্ড নেভিলের নাম এই ব্যাপারে আগেই করতে হবে। তাকে তো বলা হতো দি কিং মেকার, জান তো ?

—জানি, তবে ভালভাবে জানি না। বলুন না শুনি।

—রিচার্ড নেভিলে ওয়ারউইকের একজন গণ্যমান্য আর্ল ছিলেন। তিনি কিন্তু ঐ টুকুতেই খুশী ছিলেন না, রাজদরবারে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। হয়তো ইংলণ্ড শাসন করার স্বপ্ন দেখতেন। ১৪২২ সালে যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে ষষ্ঠ হেনরী বসলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৯ মাস। কাজেই রাজদরবারে সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে গেল। এর মধ্যে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ, জোয়ান অব আর্কের আগমন, গোলাপের যুদ্ধ ইত্যাদি তো ছিলই। এর মধ্যে ১৪৫৪ সালে ষষ্ঠ হেনরীর মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ রোগ তাঁদের মাতুল বংশের। এই সুযোগে ডিউক অব ইয়র্ক রাজার এক বছরের ছেলের হয়ে রাজ্য চালাতে থাকে। ফলে ১৪৫৮ সালে ইয়র্কিষ্ট আর ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম শুরু হল, জিতল ইয়র্কিষ্টরা অর্থাৎ ডিউক অব ইয়র্কের ক্ষমতা অপ্রতিহত রইল।

—এর মধ্যে তো রিচার্ড নেভিলের কোন অংশ নেই।

—এতদিন পর্য্যন্ত ছিল না। ১৪৫৯ সালে অঞ্জুর মার্গারেট ল্যাঙ্কাস্টয়ানদের নিয়ে ইয়র্কিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। তাকে সাহায্য করল রিচার্ড নেভিলে। এই যুদ্ধে জিত হলো মার্গারেটদের। ততদিনে ষষ্ঠ হেনরী কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন, তাই তিনি বসলেন সিংহাসনে।

—এইজন্য কিং মেকার ?

আরও আছে। রিচার্ড নেভিলে কিছুদিন বাদে দেখলেন রাজদরবারে তাঁর প্রতিপত্তি ততটা নেই যতটা তিনি চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন ইয়র্কিষ্টদের দিকে যাবেন, করলেনও তাই। তখন ডিউক অব ইয়র্ক ছিলেন এডওয়ার্ড, তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে ষষ্ঠ হেনরীকে সরিয়ে ডিউক অব ইয়র্ককে (চতুর্থ এডওয়ার্ড নাম নিয়ে) সিংহাসনে বসালেন।

১৪৬১ থেকে ১৪৭০ সাল পর্য্যন্ত নেভিলে এডওয়ার্ডের পক্ষে থাকলেও, নতুন রাজার উডভিল পরিবারের প্রতি প্রীতি তিনি সুনজরে দেখলেন না। নির্বাসিতা রানী অঞ্জুর মার্গারেটের সঙ্গে তলে তলে যোগ দিলেন আর যোগাযোগ করলেন ফরাসী রাজা একাদশ লুইএর সঙ্গে। যুদ্ধ হলো। এডওয়ার্ড পরাজিত হলেন।

সাময়িক ভাবে ষষ্ঠ হেনরী সিংহাসনে বসলেন। "কিং মেকার" রিচার্ড কিন্তু এডওয়ার্ডের শক্তি ঠিক বুঝতে পারেননি। পরের বছরই বারনেটের হলেন, পরে হত্যাও করা হয়েছিল।

—আর রিচার্ড নেভিলের কি হলো ?

—পরাস্ত রিচার্ড প্রাণ ভয়ে ফিরছিল যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে, সঙ্গে ঘোড়াও ছিল না। সেই সময়ে শত্রুপক্ষ তাঁকে পিছন থেকে ছুরিকাহত করে। তাঁর রাজা তৈরীর খেলা চিরদিনের মত শেষ হয়ে যায়।

—দুর্গের অন্যান্য আর আর অংশ কে করিয়েছেন।

—আর দুটি টাওয়ার—ক্লারেন্স আর বীয়ার, তৈরী করিয়েছিলেন তৃতীয় রিচার্ড। যদি বীয়ার টাওয়ারটি দেখ, তবে দেখতে পাবে মাঝে ভাল্লুক থাকার মত গর্ত রয়েছে। এই ভাল্লুকদের মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হতো, তারপর তাদের লড়াই দেখতেন লোকে।

—রোমের কলোসিয়ামের মত নাকি ?

—কতকটা তাই। তবে সে অনেক বড় ব্যাপার, এ তারই ছোট সংস্করণ আর কি।

—ক্লায়েন্স টাওয়ারেও কি ঐ রকম কিছু হতো ?

—না, ওটির ঘটনা অন্য।

—কি সে ঘটনা ?

—ঐ টাওয়ারটিতে আজও রাত্রে সাহস করে খুব কম লোকই থাকতে পারে ?

—কেন ?

—তা ঠিক বলতে পারব না। তবে টাওয়ারটার কথা বলি—তা হলেই বুঝতে পারবে। ঐ টাওয়ারের দেওয়াল আর গম্বুজের মধ্যে একটা এমন গুপ্ত দরজা আছে যেটা দূর থেকে কেন, কাছে গেলেও বোঝা যায় না। ঐ দরজাটা মাঝ-রাতে হঠাৎ হঠাৎ খুলে যায়, আর হু হু করে ঝোড়ো বাতাস আসে। আবার বা কখনও কখনও দেখা যায় উদভ্রান্ত এক সুপুরুষ দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—এখনও হয় ?

—এখনও।

—আপনি দেখেছেন ?

—না দেখিনি, আর দেখার ইচ্ছাও নেই।

কিছুক্ষণ থেকে গ্রেভিল বললেন—আমার মনে হচ্ছে তুমি অলৌকিক কাহিনী শুনতে ভালবাস।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম—খুব ভাললাগে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ব্যাপার যদি হয়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—তোমরা আগে ওয়ারউইক ক্যাসেলটা ঘুরে দেখে এসো, তারপর তোমাদের নিয়ে যাব কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেলে আর বলব আমার নিজের দেখা ঘটনা।

—এখনই বলুন না।

আমি জেদ করলাম।

—না, না, আগে এই প্রাসাদ দেখা শেষ কর, তারপর ওখানে গিয়ে ওটা দেখবে আর কাহিনী শুনবে।

একটু থেমে বললেন—এখানকার সংগ্রহ শালাটি দেখতে ভুলে যেও না। আমি এখানেই অপেক্ষা করব।

আমরা সঙ্গে একজন গাইড নিলাম। তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে

লাগলেন। প্রথমেই গেলাম চ্যাপেলে। ভিতরে না গেলে বুঝতেই পারতাম না এই প্রাসাদের প্রাচুর্য কত। প্রার্থনাগারটি ছোট হলেও সুন্দর এবং ঐশ্বর্য মণ্ডিত। প্রথম এটি করিয়েছিলেন বুচেম পরিবারের টমাস এবং তাঁর ছেলে রিচার্ড। পরে চ্যাপেলটিকে সুসজ্জিত করেন স্যার ফালকে গ্রেভিল।

এবার গাইড আমাদের নিয়ে এলেন খাবার ঘরে। বিশাল ঘরটি কার্পেট দিয়ে মোড়া। ছাতে প্লাসটারের চমৎকার কাজ। ফায়ার প্লেসটি মার্বেলের। লম্বা টেবিল পাতা তার উপরের রূপোর মোমবাতি দান সাজান। ঘরের সব থেকে আকর্ষণ ঝাড়বাতি আর ছবিগুলি।

গাইড একটি ছবির দিকে নির্দেশ করে বললেন এই ছবিটি প্রিন্স অব ওয়েলস ফেড্রিকের এঁকেছেন রিচার্ডসান। ছবিটি সুন্দর কিন্তু তার থেকে সুন্দর তার কারুকার্য খচিত ফ্রেম। অত সুন্দর, অমন কাজ করা ফ্রেম এর আগে আমি কখনও দেখিনি। টেবিলের অপরদিকে দেওয়াল জোড়া প্রথম চার্লসের বিশাল ছবি, এঁকেছেন ভ্যান ডিক্। ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয় তিনি যেন ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

যখন মন দিয়ে প্রথম চার্লসের ছবি দেখছিলাম তখন গাইড বলে চলেছেন— ওয়ারউইক ক্যাসেল ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের এক শক্ত ঘাঁটি। পার্লামেন্টের দলের পক্ষে ছিলেন ওয়ারউইক ক্যাসেলের মালিকরা।

কথা শেষ করে গাইড পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন অন্য ঘরে যাবার জন্য। বললেন এখন যেটায় যাচ্ছি সে ঘরটির নাম 'দি গ্রেট হল'।

নামের সঙ্গে সত্যিই সঙ্গতি রয়েছে, গ্রেটই বটে। গাইড জানালেন ঘরটির দৈর্ঘ ৬২ ফিট আর ৪০ ফিট উচ্চতা যুক্ত। শুধু মাপেই বড় নয় এর বিশেষত্ব বা greatness এ এ যেন ব্যারেণ যুগের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের জীবন্ত প্রমাণ।

জানলাম ১৮৭১ সালে এই প্রাসাদে আগুন লাগে এবং গ্রেট হলটি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপর এটিকে নতুন করে তৈরী করা হয়েছিল। সেই সময় কাঠের অর্দ্ধ গোলাকৃতি ছাত করান হয়। এখানেই গাভেস্টোনের বিচারের প্রহসন হয়েছিল।

ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে বিশাল এক কার্পেটের ছবি যার বিষয়বস্তু মার্লবরোর যুদ্ধ যাত্রা। পাশের দেওয়ালে রানী প্রথম এলিজাবেথের ছবি। তিনি রয়েছেন অভিষেকের পোষাকে। ছবির ফ্রেম এবং ছবিতে সোনার ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।

রানীর ছবির নিচেই রয়েছে একটি বিশাল কাঠের দেরাজ (ওয়াল ইউনিট)। ওয়ারউইকের কাঠের মিস্ত্রিদের তৈরী। ওয়ারউইকের আর্লের বিয়েতে শহরবাসীরা উপহার দিয়েছিল। বিশাল ঘরটিতে নানা ধরনের অস্ত্র, বর্ম, মুখোশ ইত্যাদি রয়েছে। মেঝেটি আকর্ষণীয় লাল আর শাদা মার্বেলের তৈরী। ঘরের একপাশে বিশাল মাপের একটি হাঁড়ি রয়েছে—সৈন্যদের জন্য রান্না হতো। শুনলাম পাত্রে একশ গ্যালন জল ধরতে পারে।

গ্রেট হলের সমস্ত জিনিষ বা ঘরের কাজ দেখতে হলে প্রচুর সময় দরকার। কিন্তু আমার হাতে তো সময় খুবই কম, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাইডকে অনুসরণ করে অন্য ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

যে ঘরটিতে এলাম তার নাম 'রেড ড্রইংরুম'। নামের সার্থকতা বুঝিয়ে দিতে হলো না দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই। সমস্ত দেওয়াল লাল রং তাতে সোনালি বিডিং দেওয়া। আসবাব পত্র অতি আধুনিক ডিজাইনকেও হার মানায়। এ ঘরেও চওড়া ফ্রেমের মধ্যে সুন্দর ছবি। এ ছবির কোনটি র‍্যাফেলের আঁকা, কোনটি ভ্যানডিক এর।

রাজকীয় ঘরগুলির অধিকাংশই চতুর্থ ব্যারণ রবার্ট গ্রেভিলের করা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এখানের ব্যারণ ছিলেন। রবার্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এক ধনী উত্তরাধিকারিনীর—তাঁর নাম এ্যান ডোডিংটন। ফলে রবার্ট আরও ভাল করে সাজালেন প্রাসাদটিকে। এই ঘরটির সাজসজ্জা করিয়েছেন রবার্ট গ্রেভিল। ঘরটি ছোট হলেও আকর্ষণীয়।

আর একটি বসার ঘর, 'দি সেডার ড্রইংরুম'। ঘরটি বিশাল, গাইড জানালেন, গ্রেট হলের পরই এই ঘরটির দৈর্ঘ। দেওয়াল কাঠের, তার উপর সুন্দর বাটালির কাজ। ছাতে প্লাসটারের অপূর্ব ফুল, লতা, পাতা করা হয়েছে। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া ঘর। পালিশের দেওয়ালের মাঝে মার্বেলের ফায়ার প্লেস এবং তার উপর মার্বেলের ফুলদানী আর মূর্তি যেন পবিত্রতার ছবি। অন্যান্য ঘরের মত এ ঘরেও রয়েছে অনেকগুলি ঝাড় লণ্ঠন, সুন্দর সুন্দর চেয়ার, সোফা ইত্যাদি। কার্পেটের মাঝখানে বিশাল একটি টেবিল, সুন্দর বাটালির কাজের ওপর সোনার জল করা। গাইড জানালেন টেবিলের মাথাটি ভিসুভিয়াসের লাভা জমিয়ে করা হয়েছে।

ঘরের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে ছবি। পূর্ব দিকের দেওয়ালে জার্মান রাজকুমার রুপার্ট এর, উত্তরের দেওয়ালে নিউ ক্যাসেলের ডিউকের ছবি। ছবিগুলি

ভ্যানডিউকের আঁকা। উত্তরের দেওয়ালে আরও দুটি প্রতিকৃতি রয়েছে, একটি রাজা প্রথম চার্লসের অন্যটি তাঁর স্ত্রী রানী হেনরিয়েটা মারিয়ার। আগে রানীর ছবিটি আবক্ষ ছিল, পরে ক্যানভাস জুড়ে বাকী অর্দ্ধেকটা করা হয়েছে।

এই দেওয়ালের শেষ ছবিটা দেখিয়ে গাইড বললেন—এটি হচ্ছে দ্বিতীয় আর্ল রবার্ট রিজের। এঁকেছেন ওল্ড স্টোন। দ্বিতীয় আর্লের বাবা প্রথম আর্লের নামও ছিল রবার্ট। তিনি ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেক আশা করে প্রথম জেমসের কাছ থেকে ২০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে জায়গীরটি কিনলেন। দুঃখের বিষয় এই, যে তিনি এটি ভোগ করতে পারলেন না। জায়গীর কেনার মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর ছেলে হলো আর্ল অব ওয়ারউইক। সে ছোট থেকেই রোমাঞ্চকর ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসত। অল্প বয়স থেকেই সমুদ্রে নানান অভিযান করেছে। শাদা কথায় বলতে গেলে প্রথম জীবনে সে ছিল দস্যু। এমন সময় ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ বেধে গেল আর ওয়ারউইকের আর্লের উন্নতির পথ খুলে দিল।

রাজার নৌবহরের সর্বময় কর্তা, লর্ড হাই এ্যাডমিরাল হল আর্ল অব ওয়ার-উইক। তার গঠন ক্ষমতা ছিল, ফলে রাজার সমস্ত নৌবহর তার কথায় চলত। রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে সম্পূর্ণ নৌবহর নিয়ে চলে এলো পার্লামেণ্ট দলের পক্ষে। ফলে রাজার শক্তি কমে গেল। নৌবহর না থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফল তো জানাই আছে, রাজার পরাজয়।

গল্পের একটা মোহিনী শক্তি আছে, কি শ্রোতা, কি বক্তা দুজনকেই আকৃষ্ট করে। গাইডের তাই হয়েছিল বোধ হয়। সেইজন্যে আর্ল অব ওয়ারউইকের কথা বলতে বলতে পূর্ব দেওয়ালে টাঙানো জার্মান রাজপুত্র রুপার্ট এর ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন—ইনিও গৃহযুদ্ধের সময় কম নাম করেননি। বলতে গেলে বেশীই। নামটাতেই যেন যাদু ছিল, আর ছিল সাহস, বুদ্ধি, রণকৌশল। সম্পর্কে রাজা প্রথম চার্লসের ভাগ্নে। যদিও কোন যুদ্ধে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, তবুও রাজার উপর তার প্রভাব ছিল। ১৬৪৫ সালে জুন মাসে রাজা যখন বিরুদ্ধ দলের কাছে হেরে গেলেন তখন রাজকুমার রুপার্ট প্রথম চার্লসকে অনুরোধ করেছিল পার্লামেণ্টের সর্ত মেনে নিতে। মেনে নিলে হয়তো তাঁকে প্রাণ দিতে হতো না। এই সময়েই প্রথম চার্লস সেই ঐতিহাসিক কথাটি বলেছিলেন, সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে। রুপার্ট কে বলেছিলেন "Speaking either as a mere soldier or stateman I must say there

is no probability but of my ruin. yet as a christian I must tell you that God will not suffer rebels and traitors to prosper, nor this cause to be over thrown....

একটু থেমে গাইড বললেন রাজার কথাও পরে সত্য হয়েছিল হয়তো। কিন্তু চার্লস বাঁচলেন না। থাক ইতিহাস, চলুন অন্য ঘরে যাই।

আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা স্টপার্টের কি হলো?

—স্টপার্ট ১৬৫৬ সালে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়, তারপর থেকে আর যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে না থেকে সাহিত্য এবং শিল্প নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে ছিল।

এবার যে ঘরটিতে এলাম সেটিরও আগাগোড়া কার্পেট মোড়া। দেওয়ালের রং সবুজ দেখে আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম এ ঘরের নাম 'গ্রীণ রুম' নাকি?

তিনি হেসে বললেন—ঠিকই ধরেছেন, এর নাম—দি গ্রীণ ড্রইংরুম।

দেওয়াল সবুজ বটে কিন্তু এর খুব কমই দেখা যাচ্ছে, ছবি, পর্দা আর আয়না দিয়েই প্রায় দেওয়াল ঢাকা। ছাতের প্লাসটারের কাজ চমৎকার, তার উপর সোনালী রং করা। মনে হয় যেন সবুজ বেনারসী শাড়ীর আঁচল। ঘরটি গোলাপী কার্পেট গোলাপী পর্দা আর গোলাপী আসবাবে মনোরম হয়ে উঠেছে। ফায়ার প্লেসটি এখানেও শাদা মার্বেলের। ঘরের এক কোণে একটি বড় মাপের ওয়েজ উডের ফুলদানী।

গাইড বললেন—সেণ্টার টেবিলটা দেখুন। ওয়ারউইকের আর্ল হেনরী রিচার্ড গ্রেভিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ভেনিসের গ্রিমেইন প্যালেস থেকে আনিয়েছিলেন। এর পায়াগুলিতে তাঁদের বংশের বিশেষ ছাপ রয়েছে, আর উপরটি কষ্টি পাথরের উপর কোরানেলিয়ান, এ্যাগেট, ক্যালসিডোনি, জেস্পার, লাপাসলেজুলি ইত্যাদি মূল্যবান পাথর বসিয়ে পালিস করা হয়েছে।

গাইড না জানালে বুঝতেই পারতাম না। এত উচ্চাঙ্গের পালিস যে আমি ভেবেছিলাম কাঁচ।

গাইড আরও জানালেন টেবিলটি ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের শিল্প।

ঘরে টাঙ্গান ছবির এক একটির পরিচয় দেন গাইড। ফায়ার প্লেসের উপর রাখা ছবিটি দেখিয়ে বলেন এটি লিণ্ডসের আর্ল রবার্ট বেরটির। ইনি সর্বদা রাজার পক্ষে ছিলেন, যুদ্ধে এজহিলে তিনি আহত হন। তাঁকে তাড়াতাড়ি তাঁর প্রাসাদে আনা হচ্ছিল কিন্তু সিংদরজা পেরবার আগেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে

যায়। এজন্যই অবশ্য ছবিটি দেখতে বলছি না। সীজার টাওয়ারে গিয়ে একটি ঘটনা বলব, তখন এঁর কথা মনে হবে। বাঁ দিকের ছবিটি দেখুন, ওটি হচ্ছে স্ট্যাফোর্ড এর আর্লের। ইনি গৃহযুদ্ধ হবার আগে রাজার বিশ্বাস ভাজন ছিলেন।

এরপর অন্য ঘরে এলাম। এর নাম দি কুইন এ্যান বেডরুম। রানী এ্যান যে খাটটি উইণ্ডসার ক্যাসেলে ব্যবহার করতেন, সেই খাটটি এখানে রাখা হয়েছে, তাই এই নাম।

শাদা দেওয়ালে সোনালী পঙ্কের কাজ এত সুন্দর যে অল্প সময় দেখে তৃপ্তি হয় না। পঙ্কের কাজের পাশেই লাগান রয়েছে বিশাল বিশাল কার্পেটের ছবি। গাইড জানালেন এগুলি বিখ্যাত ব্রাসেলসের কার্পেট। এতে মধ্য-যুগীয় ধনীর বাড়ীর বাগানের ছবি তৈরী করা হয়েছে। এখানকার কার্পেট সংগ্রহ দেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে গুণী, শিল্পীরা আসেন।

ফায়ার প্লেসের উপর টাঙ্গান অভিষেকের পোষাক পরা এ্যানের ছবি। আরও ছবি রয়েছে, ডেনমার্কের যুবরাজ জর্জের গ্লস্টারের ডিউকের ছবি।

ঘরের আসবাব পত্রগুলিও উইণ্ডসার থেকে এসেছে। ফায়ার প্লেসের সামনে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট সোফা রয়েছে, যেন পুতুল খেলার সামগ্রী। প্রশ্ন করলাম, —এইটুকু টুকু সোফা কি হতো?

—পঞ্চদশ লুইএর সময় একজন নতুন শিল্পী ওগুলি তৈরী করেছিলেন নমুন হিসাবে।

ঘরটিতেও প্রচুর প্লাসটারের কাজ রয়েছে। ছাতে ছাড়া প্লাসটারের টেবিল ইত্যাদি সেই যুগের প্লাস্টার শিল্পের উদাহরণ হয়ে আছে। রানীর বিছানা, যার জন্য এই নাম, সেটি সত্য আকর্ষণীয়। ছাত থেকে নেমে এসেছে লাল ভেল-ভেটের পর্দা। খাটের পাশেই একটি বড় সিন্দুকের মত রয়েছে, গাইড জানালেন এই বাক্সের ধাতুটি নতুন ধরণের তামা, দস্তা আর টিন দিয়ে এক রকম ধাতু তৈরী করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

গাইড বলে চলেন—প্রাসাদটা আর্লদের হলে কি হয় বহু রাজা, রানী এসেছেন এখানে। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়াম এখানে এসেছিলেন। তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন পঞ্চম ব্যারণ ব্রুক ফালকে গ্রেভিল। ইনি প্রথম ব্যারণ স্যার ফালকে গ্রেভিলের বংশধর। প্রথম জেমস তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন। জেমস প্রথম ব্যারণকে এই প্রাসাদটিও ভাঙা অবস্থায় দিয়ে

ছিলেন। গ্রেভিল ২০,০০০ পাউণ্ড খরচ করে এটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

মাঝপথে থেমে গিয়ে গাইড বললেন—এই সঙ্গে একটা অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে বলছি, জানি না আপনারা কতটা বিশ্বাস করবেন।

তাড়াতাড়ি বললাম—আমরা এই ধরনের কথা শুনতে খুব ভালবাসি। বলুন।

১৬২৮ সালে স্যার ফালকে তাঁর প্রিয় এবং বিশ্বাস ভাজন ভৃত্য হেউডকে বলছিলেন তাঁর সম্পত্তি কাকে কি ভাবে দেবেন, এবং কোথায় কি আছে। হেউডের ভাগে তিনি যা দেবেন বলে উইলে লিখেছিলেন তা জেনে তার ভীষণ রাগ হয় আর সে প্রভুকে ছোরা মেরে হত্যা করে। প্রভু মারা গেছে দেখে সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

গাইড থামলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কোথায়? এতো সম্পূর্ণ সাধারণ ঘটনা, লোভের ব্যাপার।

—আছে, বলছি। এই যে বাক্সটা ওটার মধ্যেই দলিলটা পাওয়া গিয়েছিল। এখনও মাঝে মাঝে রাতের বেলা অনেকে দেখেছে, ডালাটা কে যেন খুলছে তারপরই মৃত্যু যন্ত্রণার চিৎকার। এটা কি অলৌকিক নয়?

—নিশ্চয়ই। তারপর?

—তারপর দ্বিতীয় ব্যারণ ব্রুক ক্ষমতায় এলেন। গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ১৬৪৩ সনে লিচফিল্ডে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ব্যারণ দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করার জন্যে রাজা তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন আর তিনিও এক বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণীকে বিয়ে করে নিজের সমর্থ আরও বাড়িয়ে নিয়ে ছিলেন। প্রাসাদের সাজসজ্জার অধিকাংশই তাঁর অবদান।

এতক্ষণ যত ঘর দেখেছিলাম সেগুলির তুলনায় অনেক ছোট একটি ঘরে এলাম। এর নাম দি ব্লু বডার। ঘরের ছাতে প্লাস্টারের কাজ সুন্দর, মনে হয় একটা ফুলের বিরাট রিং। দেওয়ালে নীল রংএর রেশমী কাপড় দেওয়া বলে বোধহয় এই নাম। ঘরে চওড়া ফ্রেমে অনেকগুলি ছবি রয়েছে তার মধ্যে হলবিনসের আঁকা অষ্টম হেনরীর ছবিটি অতুলনীয়। রাজার দৃষ্টিতে ক্ষমতা আর লোভ যেন মূর্ত হয়ে আছে। আরও অনেক ছবিই রয়েছে ঘরটিতে।

প্রাসাদের পশ্চিম দিকে ওপর তলায় ছোট ঘরটি লাইব্রেরী। গাইড জানালেন সপ্তম এডওয়ার্ডের থাকার জন্য এই ঘরটিকে সাজান হয়েছিল। ছাতটিতে সুন্দর পেন্টিং করেছেন জ্যাকব ডিউইট। ঘর থেকে এ্যাভন নদী বড়ই মনোরম। লাইব্রেরীতে প্রচুর বই রয়েছে।

গাইড বললেন চলুন এবার এমন একটা জিনিষ দেখাব তার জোড়া বোধহয় পৃথিবীতে নেই।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—সে কি?

কারাগার!

হেসে ফেলে বলি—এ জিনিষ পৃথিবীর সর্বত্র আছে।

—এ কারাগার একেবারে ভিন্ন ধরণের। পাতালে অন্ধ কুঠরী। মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তারই উদাহরণ।

আমি কিছু বললাম না, মনে মনে বললাম দেখিনি বটে, তবে শুনেছি আমাদের দেশে রাজা জমিদারদের যম ঘর গুম ঘর থাকত। সেখানে সাপের মুখে বা হিংস্র জন্তুর মুখে ঠেলে দেওয়া হতো অপরাধীকে। অনেক সময় হয়তো বিনা অপরাধেই যেত তাদের প্রাণ।

ভাবতে ভাবতে আমরা আবার এসে পড়লাম প্রাঙ্গনে। এবার ঢুকলাম সীজার টাওয়ারে, একটু গিয়ে পেলাম সরু অন্ধকার সিঁড়ি। যদিও কোণে কোণে আলো (বর্তমান সময়ের ইলেকট্রিক আলো) রয়েছে তবু যেন অন্ধকার। ২৭টি ধাপ নেমে একটা ছোট্ট কুটরী, তার পাশে আর একটা ছোট্ট ঘর, তার মধ্যে বন্দীদের শাস্তি দেবার কত অদ্ভুত ধরণের যন্ত্রপাতি রয়েছে। ছোট্ট কুঠরীর দেওয়ালে বন্দীরা নানা কথা খোদাই করেছে। ঐ অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে কি করে যে লিখেছিল কে জানে। ঐ লেখার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি—

MAS TER JOHN SMYTH GUNER TO HIS MAJESTYE HIGHNES WAS A PRISNER IN THIS PLACE AND LAY HERS FROM 1642 TELL TH WILLIAM SIDIA ROT THIS SAME AND IF MY PEN HAD BIN BETTER FOR HIS SAKE I WOULD HAVE MENDED

EVRR LETTER MASTER

JOHN SMYTA GUNER TO H

MAJESTYS HIGHNES WAS A PRISNER IN THIS PALACE IN THE YEARE OF OVR LORD 1642-3-4-5

লেখা দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এখানে এক একজন কতদিন বন্দী ছিলেন ১৬৪২—৪৫ পর্য্যন্ত। একই জায়গায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সব শ্রেণীর মানুষকেই রাখা হতো, যেহেতু তাদের অপরাধ তারা রাজার দলের লোক।

গাইড বললেন এই ছোট কুঠরীটি ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকার,. আজ ইলেকট্রিক আলোয় হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন না। এখানে এত লোককে এক সঙ্গে রাখা হতো যে তারা ভালভাবে বসতেও পারত না, শোওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।

গাইডের কথার মধ্যেই মনে হলো কে যেন কথা বলে উঠল। দিনের বেলা (যদিও ঘরেরে একটি ছিদ্র দিয়ে আলো আসা ছাড়া বোঝার উপায় নেই দিন কি রাত), সঙ্গে লোক, তবু ঐ ভৌতিক পরিবেশে আমি কেঁপে উঠলাম। গাইড বললেন—ভয় নেই লাউড স্পিকারে কথা হচ্ছে। যন্ত্র তখন বলছে—এই চোরা কুঠরীতে কোন লোক বাস করতে পারে না। যে থাকে সে শুনতে পায় ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি, আর্ত চিৎকার, ফিস্‌ফিস্ কথা ইত্যাদি।

যন্ত্র থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—একি সত্যি ?

—নিশ্চয় না হলে এভাবে সর্বসাধারণকে সাবধান করা হচ্ছে কেন ?

ভীষণ কৌতূহল হলো, জিজ্ঞেস করে ফেললাম—আপনি তো অনেক দিন এখানে আছেন, কখনও কিছু দেখেননি ?

—বেশ কয়েকবার দেখেছি। তার মধ্যে একটা বলছি! একবার অনেক দিন আগে আমি সন্ধ্যা বেলায় এই ঘরে নেমে ছিলাম। পাহারায় যারা ওপরে ছিল তারা আমাকে বারণ করেছিল কিন্তু আমি শুনিনি। ভাবলাম ইলেকট্রিক রয়েছে তাছাড়া হাতে আছে টর্চ, ভয়টা কিসের ? নেমে এলাম। এ ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম তারপর চোরা কুঠরীতে নিচু হয়ে ঢুকতে যাব আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টর্চ জ্বাললাম! দেখি কুঠরী কোন শৃঙ্খলিত এক যুবকের পিঠের উপর বিশাল ভারি লোহার একটি চাকতি। সে সেটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। শরীরে অত কষ্ট কিন্তু চোখে তার কোন ছাপ নেই, বরং যেন গর্বের ভাব। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ খুলতে গেছি দেখি তার পাশে মধ্য বয়সী এক মানুষ, রক্তাক্ত শরীর। সে বলছে—পুত্র আমার, ভয় পেয়ো না। রাজা ভগবান, তাঁকে সর্বদা মান্য করবে। তাঁর জন্যে যত কষ্ট করবে ততই তুমি স্বর্গের দিকে এগিয়ে যাবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—কে, কে ওখানে ?

উত্তর এলো—রবার্ট বেরটি, আমি লিগুসের আর্ল। ভয়ে আমি, কে আছ বাঁচাও বলে চিৎকার করতে করতে উপরে উঠে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ছিলাম। আর কোন দিন রাতে একা এখানে আসিনি।

এবার তাগিদ দিয়ে গাইডকে বললাম—আমাদের তাড়া আছে চলুন যাই।

—সে কি, এখানকার অস্ত্রাগার দেখবেন না! দেশ বিদেশ থেকে লোক আসে দেখতে। তা ছাড়া আরও একটা আকর্ষণ আছে, বিশেষ আপনাদের জন্যে ?

—কি সেটা ?

—অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় বন্দুক এখানে আছে, যখন চকমকি পাথর ঘসে বন্দুকে আগুন লাগান হতো।

ভারতীয় নামের আকর্ষণে ঢুকলাম অস্ত্রাগারে! নানা যুগের নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে সাজান হয়েছে অস্ত্রাগার। ওয়ারউইকের আর্লরা যে সব অস্ত্রশস্ত্র উপহার পেয়েছিলেন সে সবই সাজান আছে। সব থেকে আকর্ষণীয় ঘরের মধ্যে ঘোড়ার উপর বসা বর্মপরিহিত এক মধ্যযুগীয় 'নাইটে'র মূর্ত্তি। মনে হয় জীবন্ত।

দেখতে ভাল লাগলেও কেনিলওয়ার্থে যেতে হবে তাই তাড়া ছিল। এছাড়া মিঃ গ্রেভিল বলেছেন এখানকার সংগ্রহশালাটি অবশ্যই দেখে এসো। তাই গাইডকে বললাম—আমাদের সংগ্রহশালাটিতে নিয়ে চলুন।

এখানে এসে মনে হলো একটি বিশাল ইতালীয়ান পাথরের পাত্রের জন্যই এই সংগ্রহশালাটি করা হয়েছে।

এবার বলি সেই বিশেষ পাত্রটির কথা। এমন সুন্দর আর এত বৃহৎ শ্বেত-পাথরের পাত্র আমি কখনও দেখিনি। তেমনি সুন্দর আর নিখুঁত কাজ।

গাইড বললেন—এই 'ভাস'টার একটি ইতিহাস আছে। ওয়ারউইকের আর্ল জর্জ গ্রেভিল এটা পেয়েছিলেন অর্থাৎ উপহার পেয়েছিলেন ইতালী থেকে। সে সময় নেপলস এর দরবারে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূত ছিলেন স্যার উইলিয়াম হ্যামিলটন। তিনি এবং জর্জ গ্রেভিলের কাকা ১৭৭০ সালে ইতালীর তিভোলির এক লেকের জলের মধ্যে এটিকে আবিষ্কার করে। বিশেষজ্ঞরা দেখে বলেছিলেন পাত্রটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এবং এটির শিল্পী সম্ভবত বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর সিসিয়ানের লিসিপ্পাস।

বিশালপাত্রের গায়ে সাপ জড়িয়ে রয়েছে, আর আছে গ্রীক দেবতাদের মূর্ত্তি। গাইড জানালেন এতে কোন স্ত্রীলোকের মুখ ছিল না তাই স্যার হ্যামিলটনের একটি পুরুষের মুখ সরিয়ে সেখানে একটি মেয়ের মুখ তৈরী করার জন্য শিল্পীকে বলেন। শিল্পী স্ত্রী লোকের যে মুখ করলেন সেটি লেডি হ্যামিলটনের। সম্ভবতঃ স্যার হ্যামিলটনকে খুশী করার জন্য। কিন্তু তিনি খুশী তো হলেনই না, বরং বিরক্ত হলেন, যখন দেখলেন সেই স্ত্রী মূর্তির কান দুটি গ্রীক বনদেবতা ফণ এর মত অদ্ভুত করেছে। যা হ'ক ১৭৭৪ সালে স্যার হ্যামিলটন আর জর্জ ডেভিলের কাকা পাত্রটিকে ওয়ারউইকের আর্লকে উপহার দেন। সেই থেকে এটি এখানে আছে।

আমরা আর দেরী না করে কাফেটেরিয়ার দিকে গেলাম। দেখলাম এডওয়ার্ড গ্রেভিল তখনও কাফেতে বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন— এই তো এসে গেছ, দেখা হলো ?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখলাম। আচ্ছা এখানে কতদিন পর্য্যন্ত সবাই থাকতেন ?

—সে প্রায় একশ বছর হবে, তবে এখনও এই পরিবারের লোকেরা এসে থাকেন মাঝে মাঝে। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খুবই জাঁকজমক ছিল। ১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া এখানে এসেছিলেন। তিনি ওক বৃক্ষের চারা রোপণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্ট গাই টাওয়ারে চড়ে ছিলেন, তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য দেখেছিলেন। ১৮৯২ সালে রাজা সপ্তম এডওয়াড (অবশ্য তখনও রাজা হননি) প্রথম মটর চালিয়ে এখানে এসেছিলেন।

হঠাৎ থেমে গিয়ে মিঃ গ্রেভিল বললেন আর দেরী করলে কিন্তু কেনিল ওয়ার্থ যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

বললাম—এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ?

—ট্যাক্সি কি হবে ?

—কেনিল ওয়ার্থ যাব কি করে ?

হেসে বললেন—জমিদারী না থাক চড়বার মত গাড়ী আছে তাতেই যাব।

কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেল পর্ব

ওয়ারউইক ক্যাসেলের কার পার্কে এলাম, দেখলাম সেখানে একটি বিশাল শাদা মারসিডিস দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ গ্রেভিল গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন ওঠার জন্যে। তারপর চালকের জায়গায় নিজে বসলেন। গাড়ী স্টার্ট দিলেন।

বড় রাস্তায় পড়লাম।

—আমরা যাচ্ছি উত্তর দিকে।

মিঃ গ্রেভিল কথা সুরু করলেন।

—কেনিল ওয়ার্থ ক্যাসেলও কিন্তু স্থানীয় আর্লদের প্রাসাদ। অবশ্য এর প্রথম সৃষ্টি হয় নর্মান আমলে, ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন স্থানটিকে সুরক্ষিত করার জন্য দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল। এই দেওয়ালের ঘনত্ব ১৬ ফিট।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি—১৬ ফিট! এখনও আছে নাকি?

—হ্যাঁ আছে; তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়। তোমরা ওয়ার উইক ক্যাসেল দেখে সেই ধারণা নিয়ে যদি যাও তবে আশা হত হবে।

—কেন?

—কারণ এখানে যে প্রাচুর্য ঐশ্বর্য দেখছ, ওখানে এখন তার কিছুই প্রায় নেই। শুধু আছে নরম্যান আমলের মোটা দেওয়াল আর চতুর্দশ শতাব্দীর বিশাল হল ঘর।

—ওয়ারউইক ক্যাসেল তো ঠিক রয়েছে, ওটা ধ্বংস হয়ে গেল কেন?

—আগেই বলেছি সাইমন ডি মন্টফোর্ড ওয়ার উইক ক্যাসেল ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, আর প্রায় ধ্বংস করেও ফেলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তার সংস্কার করা হয়েছিল তাই এখনও ভাল আছে।

—কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেল কে ধ্বংস করেছিলেন?

—গৃহযুদ্ধের সময় অলিভার ক্রমওয়েল প্রাসাদটিকে ধ্বংস করে ফেলেন। তারপর, ঠিক কি কারণে যে ওটার সংস্কার হলো না তা বলতে পারব না।

—তা হ'লে ওটা দেখে কি খুব ভাল লাগবে?

—হয়তো ভাল লাগবে না। কিন্তু নিয়ে যাচ্ছি অন্য কারণে।

—সে কারণটা কি ?

—ঐ যে বলেছিলাম, অলৌকিক ঘটনার সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, সেটা বলব। ঐখানে গিয়ে প্রাসাদটা দেখলে তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে।

—আচ্ছা যে প্রাসাদে যাচ্ছি, তার সব থেকে ভাল সময় কখন ছিল ?

—রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়। এটি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ ভাজন রবার্ট ডুডলের। যিনি লিসেস্টারের আর্ল ছিলেন।

—রানী এলিজাবেথের অনুরাগ ভাজন তো ছিলেন স্যার ওয়ালটার র‍্যালে, তাই না ?

—ঠিকই কিন্তু ডুডলের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। এমন কথাও রটেছিল যে রানীর সঙ্গে ডুডলের বিয়ে হতে যাচ্ছে। ডুডলের চলা, বলা, সাজ-সজ্জা এলিজাবেথকে এমন ভাবে শৈশব থেকে আকৃষ্ট করেছিল যে ডুডলেকে ছাড়া তিনি কিছু ভাবতে পারতেন না। অথচ,, রবার্ট করেনি এমন অন্যায় নেই, কিন্তু এলিজাবেথ তা কানেই তোলেন নি। স্যার ওয়ালটার র‍্যালের তাঁর সহচরীর সঙ্গে প্রণয়ের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে রানী র‍্যালেকে আর তাঁর প্রণয়িনীকে টাওয়ারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর মুক্তি দিলেও র‍্যালেকে আর আগের মত সহজ বন্ধুত্বের ভাবে কাছে ডাকতেন না।

—রবার্ট ডুডলে কি এই রকমই করেছিল ?

—এই রকম! তাহলে তো কোন কথা বলারই ছিল না। ডুডলে রানীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, আবার এ্যামি রোবসার্ট নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। শুধু এইটুকুই নয়, ডুডলে ভেবেছিল বিবাহিত জীবন প্রেমের পথের বাধা, তাই একদিন এ্যামির মৃতদেহ পাওয়া গেল তারই নিজের প্রাসাদের সিঁড়ির কাছে। গুঞ্জন উঠল রবার্ট খুন করেছে। অনেকে এই অপরাধে রানীকেও জড়াল। কিন্তু এলিজাবেথ এসব কথায় কর্ণপাতও করলেন না। এটা ছিল ১৫৬০ সাল। ডুডলের প্রতি রানীর প্রীতির প্রবাহে ভাঁটা পড়েনি কখনও।

—এ্যামির মৃত্যুর পর তো রানীর সঙ্গে বিয়ে হতে পারত ?

—তা পারত।

—তবে হয়নি কেন ?

ভদ্রলোক হেসে বলেন কেন হয়নি তা বলতে পারব না। এলিজাবেথের মনে কি ছিল জানি না। অবশ্য ১৫৬২ সালে রানীর ভীষণ রকম বসন্ত রোগ হয়েছিল। বাঁচার আশাই ছিল না। জানা যায় রানী নাকি তখন ইংলণ্ডের সিংহাসন দেখার ভার দিয়েছিলেন ডুডলে কে। যা হক সে যাত্রায় তিনি সেরে উঠলেন, সময়ে রাজ্যের শাসনভার নিজেই নিলেন।

—ডুডলে কি করলেন ?

—কি করবেন আশা ছাড়েননি রানীকে বিয়ে করার। কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেলের গেট, গম্বুজ ইত্যাদি করিয়েছিলেন রবার্ট। প্রাসাদটিকে এমন করে সাজিয়েছিলেন যে মনে হতো কোন রাজা মহারাজার প্রাসাদ। হ্যামটন কোর্টে গিয়েছ কি ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—তার যেমন সিঁড়ি খুব জমকাল করে সাজান, ডুডলে তেমনি করে এখানকার সিঁড়ি সাজিয়েছিলেন। রানী এলিজাবেথ এসেও ছিলেন এই কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেলে। ডুডলে রানীকে সম্মোহিত করতে পারত। অনেক দিন আগে এক প্রাসাদে একটা ছবি দেখেছিলাম যাতে রানী এলিজাবেথ রবার্টের সঙ্গে তন্ময় হয়ে নাচছেন।

—ডুডলের তারপর কি হলো ?

—হবে আর কি, ভাল ভাবেই কেটে ছিল। প্রথম স্ত্রীকে খুন করার পর গোপনে বিয়ে করলেন লেডি সেফিল্ডকে। তার অবস্থাও এ্যামির মতই হলো। বিষ দিয়ে তাকেও জীবন থেকে সরালেন লিসেস্টারের আর্ল। এরপরেও আছে, তৃতীয় বার বিয়ে করলেন এসেক্সের আর্লের বিধবা স্ত্রী লেট্টিস নোল্লিসকে। আগের দুটি বিয়েতে কোন সন্তান জন্মায় নি। লেট্টিস জন্ম দিলেন একটি ছেলের, নাম হলো নোবল ইম্পে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছেলেটি জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিল, বাঁচেওনি বেশী দিন।

—লেট্টিসের কি হলো ?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মিঃ গ্রেভিল বললেন হবে আর কি, আগের দুজনের যা হয়েছিল তাই হলো। একে বিষ দিয়ে হত্যা করা হলো। বলতে ভুলে গিয়েছি ; এ্যামি মারা যাবার পর মেরী কুইন অফ স্কটকে বিয়ে করার একটা ব্যবস্থা হচ্ছিল রবার্টের।

—তৃতীয়া স্ত্রীকে খুন করার পরও রানী তাঁকে পছন্দ করতেন ?

—বলেছি তো ডুডলেকে স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত করতে তিনি কার্পণ্য করেননি কোন দিন। রানী কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেল গিয়েছিলেন ১৫৭৫ সালে আর ডুডলে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। আবার ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচেদের বিদ্রোহে ডাচেদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য যে সৈন্য বাহিনী পাঠান হলো, তার অধিনায়কত্ব করলেন রবার্ট। কাজেই তাঁর আসন যে রাজদরবারে অনেক উঁচুতে ছিল তা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেনিলওয়ার্থে ফেরার সময় ১৫৮৭ সালে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। যদি তিনি এলিজাবেথের মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতেন তবে নিশ্চয়ই রানী তাঁকেই ইংলণ্ডের সিংহাসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন।

মিঃ গ্রেভিল এবার গাড়ীটা রাস্তার থেকে ডান দিকে অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় বাঁক নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল উঁচু দুর্গের ভাঙ্গা অংশ।

আমিই বললাম—ওই বুঝি কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেল ?

—ঠিক ধরেছ।

—আজ এর অতীত ঐতিহ্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবুও এর গাম্ভীর্য এর গঠন নৈপুণ্য দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে।

গাড়ী থামতে আমরা নামলাম। সরকার এই ভাঙ্গা দুর্গটিকেই কি সুন্দর ভাবে যত্ন সহকারে দর্শনীয় করেছেন তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। সুন্দর পার্কের মত, রং বেরং এর ফুল, বসার বেঞ্চি—সবই আছে।

মিঃ গ্রেভিল বললেন—চল আগে দুর্গের ভিতরটা দেখে আসবে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে উপরে গেলাম। বিশাল একটি ঘরের ভগনাংশ দেখিয়ে মিঃ গ্রেভিল বললেন, এই সেই বিখ্যাত হল ঘর। হয়তো এখানে কত বিনিদ্র রজনী মিঃ ডুডলে তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। তার মধ্যে রানী এলিজাবেথও একজন।

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললেন—আজ যদি ডুডলে বেঁচে থাকত তবে জেনে নিতাম নারীর মন হরণের কায়দাটা।

—তা হলে কি আপান নারী চিত্ত জয় করে তাদের শেষ করে দিতেন ?

—আরে না, না, ওদিকটা বাদ দিয়ে। নারী চিত্ত জয় করার অহঙ্কার তো করতে পারতাম।

—এটা তো একটা আর্ট, সেটা নিশ্চয় তিনি ভাল জানতেন।

—শুনেছি ভূতলে ছিলেন পরিচ্ছদ প্রিয়। রানীর ভাল লাগার এটাও একটা কারণ। আর ছিল অপূর্ব বাচন ক্ষমতা।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম, উপরে যাবার সিঁড়ির কাছে। এখন কয়েকটি ধাপ ছাড়া কিছুই নেই।

মিঃ গ্রেভিল বললেন—আজ আর কিছুই নেই তবু আমার এখানে আসতে ভাল লাগে, তাই প্রায়ই আসি···তবে···

—তবে কি ?

আমি তাগিদ দিই।

—তবে আর রাতে আসি না।

—আগে বুঝি রাতে আসতেন ?

—বছর কতক আগে বেশ কিছুদিন রাতে এসেছি একটা আকর্ষণে, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি না জানি না।

থামলেন কেন বলুন।

বলছি। বছর কয়েক আগে রয়াল শেকস্‌পিয়ার থিয়েটার থেকে একটা ড্রামা দেখে রাতে বাড়ী ফিরছিলাম। তখন গ্রীষ্ম কাল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আমি বেশীর ভাগ সময়েই কেনিলওয়ার্থের বাড়ীতেই থাকি। বাড়ীর পথই ধরেছিলাম এমন সময় মনে হলো চাঁদের আলোয় ক্যাসেলটা দেখলে কেমন হয় ?

যা ভাবা, তাই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘুরিয়ে এলাম এখানে। আগেই বলেছি স্থানীয় আর্ল পরিবারের হওয়ার জন্য আমাকে কোথাও অর্থাৎ ঐতিহাসিক মনুমেণ্টে যেতে কেউ বাধা দেয় না। এখানে এলাম, গাড়ী রেখে কিছুক্ষণের জন্য এই বড় সিঁড়িটায় বসেছিলাম। দেখলাম দূরে বাগানে শাদা পোষাক পরা এক মহিলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় দেখতে একটুও অসুবিধা হচ্ছিল না।

মহিলাটি কিন্তু একভাবে পিছন ফিরেই রইলেন। একটু অবাক হলাম। রাত দুপুরে একা একা মহিলা করছেন কি ? একবার ভাবলাম পরের ব্যাপারে আমার দরকার কি, যার যা ইচ্ছা তাই করুক। কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—এখানে এত রাত্রে আপনি কে ?

কোন সাড়া নেই।

আরও একটু কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম। এবার মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দ্রুত হেঁটে প্রাসাদের পিছন দিকে চলে গেল।

আমি অল্প সময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তারপর মহিলা কোন দিকে গেল দেখার জন্য দ্রুত গেলাম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। চারিধারে খুঁজলাম, তাকে পেলাম না।

অস্বস্তি কাঁটার মত খচ্ খচ্ করতে লাগল। মানুষের একটা স্বভাব, অজানাকে জানার ইচ্ছা। আমার সেই স্বভাবটাই বারে বারে মনকে উত্যক্ত করতে লাগল। কিন্তু কি করব, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম। তবে ভাবলাম, একবার যখন এসেছে, নিশ্চয় আবার আসবে।

পরের দিন একই সময় গেলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না। এইভাবে কয়েক দিন পর পর এলাম, এবং হতাশ হলাম। শেষ দিন ভেবে এলাম, আজ দেখা পাই ভাল, না হলে আর নয়।

সেদিন গিয়ে দেখি প্রথম দিনের মত একই জায়গায়, একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। স্থির করলাম আজ কথা বলবই।

এগিয়ে গেলাম। সে সরে গেল। হাত বাড়ালাম কিন্তু তখন নারী মূর্তি নাগাল থেকে বেরিয়ে গেছেন।

বিরক্ত হলাম। বললাম—কে আপনি, এত রাতে একা একা করেন কি রোজ রোজ?

পিয়ানোর রিডে যেন কে আলতো করে ছুঁয়ে গেল, ঠিক তেমনি মধুর হাসির ধ্বনি শুনলাম।

আমি মোটেই খুশী হলাম না, কণ্ঠে উষ্মা ঢেলে বললাম—হাসির কি হলো? উত্তর দিন আপনি কে?

এবার তেননি হেসেই উত্তর দিল—তুমি প্রশ্ন করার কে শুনি?

মুখ কিন্তু আমার দিকে না ফিরিয়েই কথা বলছিল। মাথা গরম হয়ে গেল—আমি প্রশ্ন করার কে তা বুঝিয়ে দিতে পারি জান!

এবার আর পিয়ানোর রিডে আলতো হাত নয়, দ্রুত, দক্ষ শিল্পীর আঙুল যেন ছুঁয়ে গেল পিয়ানোয়। তারপর হাসতে হাসতেই বলল—বুঝিয়ে দাও না।

—দেবোই তো। জান আমি কে?

—জানি না। কে তুমি ?

—এদিককার যত প্রাচীন স্থাপত্য আছে সবের দেখাশোনার ভার আমার।

—তাই নাকি ? অমন ক্ষমতা আমারও আছে। বলেই সে হঠাৎ দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি অনুসরণ করলাম কিন্তু তার মধ্যেই সে যে কেমন করে নিজেকে সরিয়ে নিল জানি না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হদিস পেলাম না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গাড়ীতে বসলাম, মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও কেন কে জানে ভীষণ ভার মনে হতে লাগল। আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী এলাম। পরের দিন বেশ জ্বর হলো। বেরতে পারলাম না। ডাক্তার এলেন, বললেন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, কদিন সাবধানে থাকতে।

দ্বিতীয় দিনেও শরীর বেশ খারাপ লাগল ইচ্ছা করছিল বেরতে, বিশেষ ঐ আকর্ষণ দুর্নিবার হচ্ছিল, তবু ডাক্তারের নিষেধ আর তার থেকেও বেশী আ্যান্টি এ্যাগনেসের বারণ ! ছোট থেকে মা ছিল না আন্টিই আদর যত্ন করে বড় করেছেন, তাই তাঁর কথা না মেনে পারি না।

কিছুই ভাল লাগছিল না তাই ওষুধ আর সামান্য পথ্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম আর একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন কত রাত হবে আমি জানি না, কিছু একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জ্বরের ঘোর লাগা চোখে, বেড-ল্যাম্পের আলোতে ঘরের চারিধারে ঠাওর করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। এক সময় মাথার দিকে চোখ তুলতেই চমকে উঠলাম। খাটের ধারে, মাথার কাছে একটি নারী মূর্তি ! গঠন দেখে বুঝলাম আন্টি নয়, কারণ তিনি স্থূলাঙ্গিনী আর এই মহিলা তন্বী।

বয়স কম, নিঝুম রাতে শয়ন কক্ষে রমণী ! এ এক অদ্ভুদ অনুভূতি ! মনে হলো ভীষণ ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। তবু মনের ভাব গোপন করেই চাপা গলায় প্রশ্ন করলাম—তুমি কে, এত রাতে আমার ঘরে এসেছ কেন ?

ধীরে ধীরে উত্তর ভেসে এলো—তুমি আমাকে চিনবে না। তুমি দুদিন কেনিলওয়ার্থ ক্যাসেলে যাওনি কেন, তাই দেখতে এসেছিলাম।

কথাটা শুনে আমার এত ভাল লাগল তোমাকে কি বলব ! আমার জন্য অপেক্ষা করছিল !

আবার প্রশ্ন করলাম—তুমি কে ? কেনই বা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে ?

নিরুত্তরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল !

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—বল না তুমি কে বা কি জন্যে আমার অপেক্ষা করছিলে ?

ধীরে ধীরে মেয়েটি বলল—অপেক্ষা করাই আমার কাজ, তাই অপেক্ষা করছিলাম।

—এই যে বললে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে।

—তোমার জন্যেও অপেক্ষা করছিলাম, তোমাকে যে আমার ভাল লেগেছে।

—যদি ভালই লেগে থাকে তবে পরিচয় দিচ্ছ না কেন ?

—তুমি চিনতে পারবে না।

—সবাই কি সবাই কে চেনে ? পরিচয় জানতে পারলে আর চেনার বাধা কোথায় ?

—বাধা দুস্তর। তোমার শরীর ভাল নেই আর কথা বলো না ঘুমিয়ে পড়। আমি যাই।

—না, না তুমি যেও না, আমার পাশে বসো।

—ঠিক আছে তুমি ঘুমাও আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সকাল হয়ে গেছে। আশ্চর্য রাতের কথা আমার সব থেকে কাছের মানুষদেরও বললাম না।

পরের দিন আবার এলো।

এমনি করে প্রায় দিন কুড়ি সে এলো। তখন তার পরিচয়ের জন্য আমি ক্ষেপে উঠেছি। মন ঠিক করে ফেললাম ওকে বিয়ে করব। রাতে যখন এলো বললাম—আজ তোমাকে পরিচয় দিতেই হবে, না হলে ছাড়ব না।

—কি হবে পরিচয় জেনে ?

—বিয়ে করব। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না।

—আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

—তা হক, আইনের আশ্রয় নিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করবই।

—আমার বিশ্বাস হয় না। এই রকম কথা সেও বলত। কিন্তু বিয়ের পর আর ফিরে তাকাতও না, কোথায় চলে গেল তার প্রেম কে জানে ! কিন্তু আমি তার প্রতিক্ষায় আজও বসে আছি।

—তোমার পরিচয় যদি না দাও তাহলে আমি কিন্তু এমন একটা কাণ্ড করব যে তোমাকে বলতেই হবে।

মেয়েটি বলল—ঠিক আছে বলছি—আমি লেডি সেফিল্ড। গোপনে বিয়ে

হলো, কত সুন্দর সুন্দর কথা শোনালে। লোভে পড়েই বিয়ে করলাম। তারপর চলল প্রতিক্ষা। স্বামীর মন পেলাম না কোন দিনও। স্বামী নিজের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত। শেষে আবার সে আর এক ধনী মহিলাকে বিয়ে করল। মেয়েটির দোষ কি বল সে তো জানে না। দোষ তো আমার স্বামীর। তবু প্রতিক্ষা করি। যদি দেখা পাই।

—তোমার স্বামী কে বল, আমি ঠিক চিনতে পারব।

—তা পারবে। আমার স্বামী আর্ল অব লিসেস্টার রবার্ট ডুডলে।

আর কিছু মনে নেই। সেই থেকে আর রাতে এখানে আসি না। চল সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আর থাকা ঠিক নয়। চলে এসেছিলাম।

উইণ্ডসর ক্যাসেল পর্ব

প্রাসাদ দেখার নেশায় এবার বেরিয়েছিলাম উইণ্ডসর ক্যাসেল দেখতে। সাড়ে আটশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই প্রাসাদটি প্রভাবিত করেছে ইংলণ্ডের উত্থান পতনের ইতিহাসকে। কত পাওয়া না পাওয়ার কাহিনী জড়িয়ে আছে এই বিশাল প্রাসাদে। আগে যে সব দুর্গ বা রাজবাড়ির কথা বলেছি তাদের শুধু আছে অতীত। অর্থাৎ বর্তমানে সে আর তেমন ভাবে দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নেই। কিন্তু উইণ্ডসার ক্যাসেল আগের মত না হলেও এখনও রাণীর বাসভবন ; বছরের কিছু সময় রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বা তাঁর মা ওখানে বাস করেন।

বেরিয়েছিলাম রেডিং থেকে, উইণ্ডসর শহরে পৌছবার আগে বেশ কয়েকটা 'গথিক' ধাঁচের বাড়ি চোখে পড়ল। নিশ্চয় ওখানে রাজ পরিবারে কেউ না কেউ থাকতেন, আজ হয়তো বা শূন্য পড়ে আছে—এইসব ভাবতে ভাবতে এসে পড়লাম উইণ্ডসরে। বাস থেকে নেমে প্রাসাদ দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে চোখে পড়ল পাহাড়ের মাথায় বিশাল গোল গোম্বুজের মত পাথরের বাড়ি।

রাস্তা দিয়ে কিছুটা উপরে উঠেই পেলাম বিশাল গেট। সেখানে প্রহরী

দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই ধরণের গার্ড দেখেছি লণ্ডনের বাকিংহাম প্রাসাদে, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাথরের মূর্তি। ফটক পেরিয়ে চড়াই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পাথরের ধারে ধারে সুন্দর বাগানও রয়েছে। কিছুটা ওঠার পর বিশাল এক খিলানের কাছে এসে পড়লাম। তার দুধারে দুটি ত্রিতল বিশিষ্ট গম্বুজ বাড়ি। জানলাম এটির নাম "হেনরী এইট গেটওয়ে"। ভাবলাম গাইড ছাড়া এই প্রাসাদ দেখে কোন লাভ হবে না।

মিঃ হিলটন নামে একজন ভদ্রলোক আমাদের রাজবাড়ি সব ঘুরিয়ে দেখাবেন, এই ঠিক হলো তিনি বললেন, চলুন সামনে কোন ছায়ায় বসে আগে প্রাসাদের ইতিহাসটা বলে নিই। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা পাহাড়ের ধার ঘেঁসে পাথরের উপর বসলাম। দূরে টেমস নদী দেখা যাচ্ছে। নিচে উইণ্ডসর শহরের ঘর বাড়ি ছবির মত পড়ে আছে।

সুন্দর দৃশ্য তন্ময় হয়ে দেখছিলাম, মিঃ হিলটনের কথায় চমক ভাঙ্গল—এবার তবে সুরু করি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

তিনি সুরু করলেন—উইণ্ডসার ক্যাসেলকে টাওয়ার অফ লণ্ডনের সমসাময়িক বলা চলে, মানে ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে হয়েছিল। কারণ ১০৮৪ সালে লিখিত ডুমসডে বুকে উইণ্ডসর ক্যাসেলের নাম পাওয়া যায়। এটা প্রথম পত্তন করিয়েছিলেন উইলিয়াম দি কনকরার।

—এই রকম সময়েই তো টাওয়ার অফ লণ্ডন হয়েছিল। তাই না?

—ঐ সময়েই টাওয়ার অফ লণ্ডন হয়েছিল উইণ্ডসার শহরে, এখান থেকে দু মাইল দূরে নদীর ধারে স্যাক্সনদের একটি প্রাসাদ ছিল। উইলিয়াম দি কনকারার সেই প্রাসাদটিকে জয় করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। কাছাকাছি বনে জঙ্গলে শিকার করতেন, বেশ আনান্দই কাটাছিলেন, হঠাৎ এক সময় তাঁর আক্রমণকারী মন তাঁকে সচেতন করে দিল—স্থানটি অরক্ষিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে দুর্গ, প্রাচীর পরিখা ইত্যাদি করার বাসনা জাগাল। সেইজন্য তিনি পাহাড়ের ওপর একটি স্থান বেছে নিলেন। যেখানে শত্রুদের যাওয়া অসম্ভব। তবে ঠিক কোন বছর এর কাজ সুরু হলো তা বলতে পারব না।

অতীতে এর নক্সা কেমন ছিল তাও বলা যায় না। সম্ভবতঃ এখনকার মতই ছিল। উইলিয়াম চেয়েছিলেন লণ্ডন বা তৎসংলগ্ন স্থানে দুর্গ এবং প্রাচীর নির্মাণ করবে। এইজন্য তিনি একটি মাটির টিলা প্রস্তুত করান। টিলার মাটি যেখান

থেকে নেওয়া হতো সেখানে মাটির মধ্যে খড়ি পাওয়া গেল। সেই খড়ি মাটি দিয়েই তৈরী করা হলো টিলা। তারপর কাঠের দেওয়াল দিয়ে সেটিকে সুরক্ষিত করা হলো। এরপর ১১৮০ সালে দ্বিতীয় হেনরী স্থানটিকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য পাথরের বিশাল প্রাসাদ তৈরী করালেন। বর্তমানে যেটিকে বলে রাউণ্ড টাওয়ার তারই অর্দ্ধেকটা তখন হয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রবেশ দ্বারও করার ব্যবস্থা ছিল, অবশ্য তখন কিছুই হয়নি। অনেক দিন পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড সেটি করিয়েছিলেন। যদিও গেটটির নাম নরম্যান গেট।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা প্রাসাদটিতো মনে হলো ধাপে ধাপে গড়া হয়েছে।

—ঠিক কথা, সময়ের দিক থেকে যে তিনবারে তিন ধাপ, তা কিন্তু না, হয়তো অনেক বেশী সময় লেগেছে। তবে উচ্চতার দিক দিয়ে বলতে গেলে, লোয়ার ওয়ার্ড, মিডল ওয়ার্ড আর আপার ওয়ার্ডে ভাগ করা আছে। ঐ গেটটি আপার ওয়ার্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে রাজা রাণীদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পাশেই দেখা যাবে কিং জন টাওয়ার।

মিডল ওয়ার্ডে রাউণ্ড টাওয়ার অবস্থিত। টিলাটির উচ্চতা ৫০ ফিট আর রাউণ্ড টাওয়ারের বেড় ১০০ গজ। গোল টাওয়ারের মধ্যে একটি কুয়ো এখনও আছে। উইলিয়ামের সময়কার কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই, তাতেই মনে হয় তখন সবই ছিল কাঠের তৈরী, আর প্রথম দিকে এটি কেবল মাত্র সৈন্যবাস রূপেই ব্যবহৃত হতো! প্রথম হেনরী ১১০০ শাল নাগাদ এখানে বসবাস সুরু করেন। অবশ্য তার একটি কারণ আছে, হেনরীর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। সেজন্যে হয়তো তিনি সুদৃঢ় একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন।

দুর্গটিতে এর পরে যাঁর অবদান রয়েছে তিনি দ্বিতীয় হেনরী। তিনি সমস্ত কাঠের প্রাচীর তুলে দিয়ে পাথরের দেওয়াল দিয়েছিলেন তার মাঝে মাঝে চৌকানো থাম দেওয়া। তিনিই পাহাড়ের মাথায় সর্বদা ব্যবহারের জন্য এক পাঁচিল করিয়েছিলেন।

এরপর যাঁর নাম করতে হয় তিনি দ্বিতীয় হেনরী। তিনি এই দুর্গটিকে সুদৃঢ় করার জন্যে পাথরের পাঁচিল করিয়েছিলেন। আজও তা দ্বিতীয় হেনরীর সাক্ষ্য বহন করছে। পাথরের দেওয়াল যেখানে করিয়েছেন সেখানে আগে

কাঠের রেলিং ছিল। এছাড়া দুর্গও করিয়েছিলেন। যদিও সেটি রাউণ্ড টাওয়ারের মত অত সুন্দর বা নিখুঁত হয়নি।

এতদিন ধরে দুর্গটি থাকলেও কোন আক্রমণ হয়নি। ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই দুর্গটি প্রথম আক্রান্ত হলো। সেই রুয়েনের আর্চবিশপের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের ব্যারণরা উইণ্ডসর ক্যাসেল আক্রমণ করে। এর পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সলসবেরির আর্চবিশপ। এই সময় রাজকুমার জন যোকে পরবর্তিকালে উইকেড কিংল্যাকল্যাণ্ড ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যারণদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি, কোনক্রমে পালিয়ে ফরাসী দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরপর রাজা হয়ে জন এই প্রাসাদে অনেকদিন ছিলেন। বিশেষ করে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ থেকে ২৩শে জুন তার পক্ষে ভয়ঙ্কর এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই সময় জোর করে তাঁকে ম্যাগনাকাটায় সই করান হয়েছিল। অবশ্য সই করান হয় রুনিমিডে, প্রাসাদ থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

এতেও শান্তি হলো না। পরের বছর ব্যারণরা আবার প্রাসাদ আক্রমণ করল। কিন্তু বিজয়লাভ হলো না। তবে লোয়ার ওয়ার্ড বেশ ক্ষতি হয়েছিল। তৃতীয় হেনরী সিংহাসনে এসেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপত্যে সংস্কার করান, তৃতীয় হেনরীর চরিত্রে অনেক দোষ থাকলেও একটি মহৎগুণ ছিল—মধ্যযুগীয় স্থাপত্যে সংস্কার করা। সেই সময় উইণ্ডসর ক্যাসেলে যে সব কাজ হয়েছিল তার অনেক কিছু এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

তৃতীয় হেনরীর সময়ে তৈরী কারফিউ টাওয়ার আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সেইজন্যই নয়, এর স্থাপত্য কলা আজ দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। ১৮৬৩ সালে ফরাসী স্থপতি স্যালভিন, প্যালেসের সম্মুখভাগে কিছু কারুকার্য করলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্থাপত্যের এটি একটি বিশিষ্ট নজীর। এই টাওয়ারে একজোড়া পবিত্র মোজা রয়েছে। টাওয়ারের ভিতরটি খড়ি দিয়ে তৈরী। এর নিচে একটি পাতাল ঘর আছে, বন্দীরা সেখান থেকে পালাতে চাইলেও পারে না কারণ দেওয়াল এত পুরু। দুর্গে শত্রুদের হাত থেকে পালাবার জন্য তিনটি গুপ্ত পথ আছে তার মধ্যে একটি রয়েছে কারফিউ টাওয়ারে।

এই টাওয়ারের উপরে রয়েছে বিশাল এক ঘড়ি। অন্যান্য ঘড়ির মত এর হাত ঘোরে আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় গীর্জার মত মিষ্টি আওয়াজ হয়। ১৬৮৯ সালে স্থানীয় অধিবাসী জন ডেভিড ঘড়িটি তৈরী করেছিলেন।

তৃতীয় হেনরীর পর কাসেলটির রূপসজ্জায় যাঁর অবদান আছে তিনি হলেন তৃতীয় এডওয়ার্ড। এই প্রাসাদেই ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এডওয়ার্ডের জন্ম। তিনি বড় হ'য়ে এখানে অনেক বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। দু একটি ছাড়া এডওয়ার্ডের করা সমস্ত প্রাসাদ বা বাড়ীর অঙ্গে কিছু না কিছু রদবদল করা হয়েছে। তবে তাঁর তৈরী নরম্যান গেটওয়ে অবিকৃত আছে। এডওয়ার্ডের সব থেকে বড় অবদান কলেজ অফ সেণ্ট জর্জ। এটি ছিল ধর্ম-যাজকদের জন্য। তিনি চ্যাপেলটিকেও বড় করেছিলেন যাতে ধর্মীয় লোকেরা থাকতে পারেন। এডওয়ার্ড হয়তো আরও অনেক প্রাসাদ ইত্যাদি করতেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে কোন কারণে এই কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। সম্ভবতঃ এর কারণ 'ব্লাকডেথ'। ১৩৪৮-৪৯ সালে প্লেগ মহামারী আকার ধারণ ক'রে ব্রিটেনের প্রায় অর্দ্ধেক লোক বিনাশ করে দেয়। সেই সময় দেশে মিস্ত্রি এবং মজুরের সংখ্যা ভীষণ হ্রাস পায়, ফলে মজুরীর হার হয় আকাশচুম্বী। যার অবশম্ভাবী ফল দেশের কৃষক বিদ্রোহ।

গাইড একটু থেমে বললেন—আমি কথা বলতে বলতে উইণ্ডসার ক্যাসেল থেকে ব্ল্যাক ডেথে চলে গেলাম। ব্ল্যাক ডেথের প্রত্যক্ষ ফল যদিও এই প্রাসাদে পড়েনি তবে পরোক্ষ ফল প্রভাবিত করে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যা হক এরপর প্রার্থনাগার সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল ১৩৯০ সালে কিন্তু কাজ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মাঝে মাঝে কাজ হলেও তেমন ভাবে কিছুই হয়নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পুরোপুরিভাবে মেরামতের কাজ হয়। রাণী প্রথম এলিজাবেথ প্রায়ই এখানে থাকতেন এবং এখানকার অনেক কিছুতে তাঁর অবদান।

উইণ্ডসর ক্যাসেল চিরদিনই দেশের রাজনৈতিক ওঠাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত। প্রথম চার্লসের সময় পার্লামেণ্ট আর রাজশক্তির মধ্যে যে বিরোধ চলছিল তার কেন্দ্রস্থল রূপে কাজ করে ছিল এই উইণ্ডসার ক্যাসেল।

মিঃ হিলটন চুপ করলেন। তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে অতি গোপনীয় কথার মত বললেন—এই প্রসঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলতে পারি, জানি না আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না। অবশ্য আপনারা মন্ত্রতন্ত্রের দেশের লোক। মনে হয় আপনারা করবেন।

ব্যস্ত হয়ে বলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করি আপনি বলুন।

তিনি শুরু করলেন—অনেক দিন আগের কথা বলছি, আমি তখন সেণ্ট জর্জ চ্যাপেলে কাজ করি। রাত্রে আমার ডিউটি পড়েছে। মাসটা ফেব্রুয়ারী। আর

সেবার এত ঠাণ্ডা পড়েছিল কি আর বলব। পাগলা বাতাসের সঙ্গে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে। রাত নিশুত। হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক একটা কফিন বহন করে এদিকেই আসছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেলাম। তারা কিন্তু আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সব ব্যাপারের নিয়ম থাকে। মৃতদেহ কববস্থ করার ব্যাপারে তো আছেই, কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চলল। আমি রেগে বললাম—কে তোমরা? থাম ভিতরে যেও না। তাদের মধ্যে থেকে একজন মুখে 'হুস্' শব্দ করল অর্থাৎ চুপ করতে বলল।

কিন্তু থামল না। দ্রুত পায়ে অষ্টম হেনরী আর জেন সাইমোরের সমাধির কাছে গিয়ে কফিনটা রাখল। আমি চিৎকার করে বললাম—কে তোমরা? কার মৃতদেহ? না বললে আমি গুলি করব। খবরদার।

আবার মুখে হুস্ করে শব্দ করল। তারপর তাদের মধ্যে একজন কফিনের ঢাকাটা খুলে দিল। দেখলাম, ছিন্ন শির একটি দেহ।

বলে উঠলাম—বন্ধ কর বন্ধ কর, কে এই হতভাগ্য?

উত্তর পেলাম—দুর্ভাগা রাজা প্রথম চার্লস।

—কি বললে??

যখন আমার জ্ঞান ফিরেছিল তখন দেখেছিলাম এখানকার আর্চ বিশপ আমার মাথার কাছে বসে আছেন। তাঁকে আমি ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তিনি বাধা দিয়ে বললেন—আমি জানি সব। বেচারা প্রথম চার্লস, দেশকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ব্যারণদের বিচারে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর শিরশ্ছেদ হওয়ার জন্য আমার যত না দুঃখ তার থেকে দুঃখ তাঁকে সমাহিত করার কোন ব্যবস্থাই কেউ করল না। মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর, তুষাব ঝরা শীতের রাতে তাঁর দেহটি গোপনে এখানে এনে রাজা অষ্টম হেনরীর সমাধির তলায় সমাহিত করে। ফেব্রুয়ারী মাসে তুষার ঝরা রাত হলে মাঝে মাঝে তাদের দেখা যায়। যীশু তাঁদের শান্তি দিন, এই কামনা করি।

আমি কাহিনী শুনে প্রশ্ন করি—আচ্ছা মিঃ হিলটন আপনি কি আর কোন দিন তাঁদের দেখেছেন?

মিঃ হিলটন বুকে ক্রশ কেটে বললেন—না, আর কোন দিন দেখিনি, আর দেখতেও চাই না। জীবনে যে শান্তি পাননি মৃত্যুর পর যেন তাই পান। প্রথম চার্লসের পর এলেন দ্বিতীয় চার্লস। তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসার আগে

অনেক দেশে ঘুরেছিলেন, বিশেষ করে ফ্রান্সে। তিনি দেশে ফিরে যখন উইণ্ডসার ক্যাসেল দেখলেন তখনই মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হলো, এই প্রাসাদকে ইচ্ছা করলে ফ্রান্সের ভারসাই প্রাসাদ করা যাবে। এ ছাড়া মৃগয়ার উপযুক্ত স্থানও বটে। তিনি কাজ সুরু করে দিলেন। তাঁর সময় থেকেই বলতে গেলে গথিক স্টাইলের প্রাসাদ তৈরীর কাজ হয়। অনেক জায়গার সাজসজ্জা ভারসাই প্রাসাদের অনুকরণে করা হয়েছে। অনেকগুলি ছাতে পেন্টিং এর কাজ করেছেন ইটালীয় শিল্পী ভেরিও, কাঠের কাজ করেছেন গ্রিনলিং গিবসন।

দ্বিতীয় চার্লসের পর বেশ কিছুদিন উইণ্ডসর ক্যাসেল অনাদৃত হয়ে পড়ে। রানী এ্যান মাঝে মাঝে এখানে থাকলেও বেশীর ভাগই থাকতেন অন্যত্র। তবে তাঁর সময়কার ব্লেনহেমের বিজয়ের খবর তিনি এখানেই পেয়েছিলেন। এরপর সিংহাসনে এলেন প্রথম জর্জ, তারপর দ্বিতীয় জর্জ। কিন্তু তাঁরা কেউই উইণ্ডসর ক্যাসেলকে পছন্দ করেননি ফলে প্রাসাদটি অবহেলিত হতে থাকে, ১৭৬০ সালে তৃতীয় জর্জ রাজা হলেন। তাঁর মধ্যে ছিল শিল্পী সত্বা। উইণ্ডসর ক্যাসেল ভাল লাগল তাঁর। কিন্তু তখন এখানকার প্রাসাদে তাঁর তেরটি সন্তান নিয়ে বাস করার মত অবস্থা ছিল না, প্রাসাদের সংস্কার কার্য অতি প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি তার ব্যবস্থা করলেন এবং প্রাসাদের নিকটেই একটি বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার কাজ শেষ হলে তিনি সপরিবার প্রাসাদে চলে আসেন। ১৮১১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাসাদের কিছু না কিছু উন্নতি করেছেন। এই সময় হঠাৎই তিনি অন্ধ হয়ে যান আর তাঁর স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়, সেজন্য এই প্রাসাদের ক্রমোন্নতির পথে বাধা পড়ে।

তৃতীয় জর্জে পুত্র চতুর্থ জর্জ পিতার অসুস্থতার জন্য রাজ্যের ভার নিলেন। তিনি দেখলেন প্রাসাদের আরও উন্নতি করা সম্ভব এবং তাঁর পিতার আবাস স্থানটির সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। তখন তিনি প্রাসাদ সংস্কার বাবদ পার্লামেন্টের কাছে ১৫০,০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ বিশাল প্রাসাদের পক্ষে অর্থ কমই ছিল। যা হক এই কাজের ভার পড়ে জেফ্রি উইটের ওপর। তিনি সুন্দর ভাবে এই প্রাসাদটি গড়েছিলেন। তাঁর জন্যই প্রাসাদটি দূর থেকে এবং নিকট থেকে এত সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত মনে হয়। যদিও তাঁকে মাঝে মাঝেই অর্থাভাবের সম্মুখিন হতে হয়েছে।

অল্প স্বল্প সংস্কার কাজ হয়েছে তার পরও। রানী ভিক্টোরিয়ার সময় থেকে উইণ্ডসর পেলো রাজপ্রাসাদের সম্মান। তাঁর স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্টও লণ্ডনের

থেকে শান্ত পরিবেশের স্থান এই উইণ্ডসরকে পছন্দ করতেন। রেলপথ হবার পর থেকে উইণ্ডসরের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেলো। ১৮৬১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এ্যালবার্ট টাইফয়েড উইণ্ডসর ক্যাসেলেই মারা যান। রানী ভিক্টোরিয়ার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়, তিনি তাঁর স্বামী যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরটি তেমনি করেই সাজিয়ে রেখেছিলেন ঠিক যেমনটি মৃত্যু সময় ছিল। টেবিলে ওষুধপত্র, গ্লাসে জল—সমস্ত রাখা থাকত। অনেকে বলেন প্রিন্স এ্যালবার্ট নাকি রাতে আসতেন তাঁর ঘরে। যা হক সপ্তম এডওয়ার্ড যখন রাজা হলেন তিনিও প্রিন্স এ্যালবার্টের ঘর তেমনিই রেখে ছিলেন। ক্রমশঃ সেইভাবে রাখার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত কম বিপদসঙ্কুল, এই কথা চিন্তা করে রাজ পরিবারের সকলে এখানে বাস করতেন। দ্বিতীয় এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর বংশের ধারার নাম রাখলেন উইণ্ডসর।

এতক্ষণ প্রাসাদের ইতিহাস বলে তিনি থামলেন, তারপর বললেন—আপনাকে এই প্রাসাদের একটা মোটামুটি কাহিনী শোনালাম, এবার চলুন প্রাসাদটা দেখবেন।

চলতে চলতে গাইড বললেন—একদিনে তো সব দেখা সম্ভব নয় সেজন্য চলুন রাজাদের বাসস্থান আর সেণ্টজর্জ চ্যাপেলটা দেখিয়ে দিই।

আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম। রাজ প্রাসাদের বাসস্থানে এসে প্রথমে উঠলাম 'দি গ্র্যাণ্ড স্টেয়ার কেস' দিয়ে। উপরে পৌছবার মাঝপথেই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সেখানে রয়েছে চতুর্থ জর্জের বিশাল শ্বেত পাথরের মূর্তি। তার দুপাশে এবং সামনে রয়েছে মানুষাকৃতি বর্ম। মনে হয় যেন এক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে যে সব অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তার অধিকাংশই রাজা অষ্টম হেনরীর সময়কার।

মিঃ হিলটন আমাদের দিকে ফিরে বললেন এই রকম প্রাসাদ হলে নানা জনে নানা কাহিনী বলে, তার কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা তা কেউই জানে না, এমন কি বক্তা পর্য্যন্ত নয়।

—কেউ কিছু দেখেছিল নাকি ?

—বলে তো দেখা যায়।

—বলুন না শুনি।

—কেউ দেখেছে সুদর্শন এক যুবকের সঙ্গে একটি মহিলা ঘুরছে আর বলছে

—তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যাই হক তুমি তো আমার স্বামী। কেউ বা দেখে মুখরা এক নারী এক যুবককে বলছে আমাকে ত্যাগ করার তোমার কোন অধিকারই নেই, আমাদের সন্তানই হবে সিংহাসনের অধিকারী। যুবক শান্ত, ভদ্রভাবে বলেন—আমি মন থেকে তোমাকে কোন দিনই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিনি।

—এঁরা কারা ?

—যুবকটি চতুর্থ জর্জ। তিনি অসম্ভব ভদ্র ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষক বলতেন—He will be either the moshed polished gentleman, or the most accomplished blackguard in Europe—possibly both. যুবক জর্জের প্রতি অসংখ্য নারী আকৃষ্ট হয়েছে। ১৭৮৫ সালে তিনি মিসেস ফিজার বাটকে বিয়ে করলেন। মহিলাটির আগে দুবার বিয়ে হয়েছিল তাছাড়া তিনি ছিলেন ক্যাথলিক। জর্জ তখন যুবরাজ মাত্র, তাই ফিজার বাটকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন। সে সময় ক্যাথলিককে বিয়ে করলে সিংহাসন পাওয়া যেত না। সেজন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে রাজার ইচ্ছানুসারে ক্যারোলিন নামে এক মহিলাকে বিয়ে করতে হয়। তাঁকে তিনি কোন দিনই মন থেকে গ্রহণ করেননি। তাঁদের একটি সন্তান হয়েছিল। কিন্তু সেও বেশী দিন বাঁচেনি। তৃতীয় জর্জ মারা যাবার পর চতুর্থ জর্জ ক্যারোলিনকে ত্যাগ করেন। অনেকের ধারণা ঐ সব অভিশপ্ত আত্মাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

দোতলায় ওঠার মুখে দুধারে দুটি অশ্বারোহির মূর্তি। অস্ত্রাগারটিও দেখার মত। এখানে নানা যুগের অস্ত্র এবং অনেকের স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে, তার মধ্যে নেপোলিয়ানের স্মৃতি চিহ্নও বাদ যায়নি।

চতুর্থ জর্জের মধ্যে একটি শিল্পী সত্তা ছিল আর ছিল আমোদপ্রিয়তা। তিনি ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ানের উপর বিজয়কে স্মরণীয় করার জন্য শিল্পী স্যার টমাস লরেন্সের ওপর ভার দিয়েছিলেন যে সব রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা বা রাজা এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ছবি আঁকতে। সে সময় এত ছবি আঁকা হলো যে এক সমস্যা দেখা দিল সেগুলিকে রাখার। ১৮২৪-৪০ সালে যখন উইটভিল উইণ্ডসর ক্যাসেল সংস্কার করছিলেন সে সময় ছবিগুলি রাখার জন্য গ্যালারির ব্যবস্থা করলেন। যার ফলেই গড়ে উঠল ওয়াটারলু চেম্বার। এখানে দীর্ঘ একটি টেবিল আছে যাতে ১৫০ জন মানুষ এক সঙ্গে বসে খেতে পারে।

ওয়াটারলু যুদ্ধে বিজয়ের স্মারক হিসাবে প্রতি বছর ২৮ই জুন এখানে ভোজের আয়োজন হতো। এখনও সেই অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে।

ওয়াটারলু চেম্বারে ঢুকলে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তার বিশালত্ব, দেওয়ালের কারুকার্য, ঝাড়-বাতি, পেন্টিং (তার মধ্যে সব থেকে আকর্ষনীয় চতুর্থ জর্জের ছাব)। দেড়শো চেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ খাবার টেবিল। আর একটি জিনিষ সকলেরই ভাল লাগবে এবং ভারতীয় বলে সেই মুহূর্তে একটা গর্ব হলো, সেটা ঐ ঘরে পাতা অপূর্ব কার্পেটটি। ইউরোপের বৃহত্তম বেজোড় কার্পেট। এটি আমাদের দেশে আগ্রাতে তৈরী। গ্রিণলিং গিবসনের হাতে সূক্ষ্ম বাটালির কাজ ঘরটির মহোত্ব আরও বাড়িয়েছে। ঘরে আলো আসার জন্যে ছাতের নিচে সারিবদ্ধ কাঁচের জানলা করা হয়েছে। ঘরটি শেষ হবার আগেই চতুর্থ-জর্জের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ছবিটি এমন জায়গায় টাঙ্গান আছে আর তাঁর তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটি এত সুন্দর যেন মনে হয় তিনি ঘরের সাজ-সজ্জা দেখে তৃপ্তি লাভ করছেন। পেন্টিংগুলির মধ্যে আর একটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে ডিউক অফ ওয়েলিংটন-এর ছবি। সুদর্শন তরুণ যুবকের অঙ্গে ফিল্ড মার্শালের পোষাক, হাতে কোষমুক্ত তরবারি, পিছনে দেখা যাচ্ছে সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল। ছাবটি সুন্দর বলেই আমাকে আকর্ষণ করেনি, করেছিল অন্য কারণে। মনে পড়ে গেল ইনিই একদিন টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

আমি মিঃ হিলটনকে জিজ্ঞেস করলাম—বলুনতো ওয়েলিংটন কবে ভারতে গিয়েছিলেন ?

—খুব কম বয়সেই, মাত্র সতেরো বছর বয়সে। সেখানে অনেকদিন ছিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম তিনি অনেক রকম ভারতীয় ভাষাও শিখে ছিলেন। অনেক যুদ্ধও করেছিলেন।

—হাঁা, জানি। চলুন অন্য ঘরে যাই।

এবার আমরা অন্য একটি ঘরে এলাম। বড় ঘরটি জুড়ে নীল কার্পেট পাতা, তার উপর লাল ভেলভেটের দু সারি চেয়ার। শেষ দিকে দেওয়ালের ধারে, লাল ভেলভেটের চন্দ্রাতলের নিচে একটি বিশেষ চেয়ার পাতা। ঘরটির নাম গারটার চেম্বার। এখানে গারটারটার এ্যাসেম্বলির নাইটরা রাজার নেতৃত্বে জুন মাসের নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এ ঘরেও গ্রিনলিং গিবসনের কাঠের কাজ রয়েছে।

পাশে আর একটি ঘরে গেলাম। তার নাম গ্র্যাণ্ড রিসেপসান রুম। ঘরের ঝাড়, কাঠ এব প্লাস্টারের কাজ আমার মনে হয় উইণ্ডসর ক্যাসেলের অন্যান্য ঘরের থেকে অনেক বেশী উচ্চমানের। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর কার্পেটের ছবি, কারুকার্য করা চেয়ার, টেবিল, পাথরের মূর্তিগুলি দর্শককে অভিভূত করে।

মিঃ হিলটন বললেন, লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, এ ঘরের সাজসজ্জা একটু অন্য ধরনের।

—ঠিক বলেছেন আমি তাই ভাবছিলাম।

—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের মত করে ঘরটি সাজান হয়েছিল।

ঘরের শেষ প্রান্তে বিশাল নীলাভসবুজ রংএর 'ভাস' রয়েছে। মিঃ হিলটনকে বললাম—ভাসটি খুব সুন্দর কিন্তু এখানকার এই সব সোনালী কাজের সঙ্গে যেন সঙ্গতি নেই।

—না থাকারই কথা। ঐ পাত্রটি রানী ভিক্টোরিয়াকে টার নিকোলসন (প্রথম) দিয়ে ছিলেন। আর দেওয়ালে টাঙ্গান কার্পেটের ছবিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে চতুর্থ জর্জের জন্য প্যারিস থেকে আনানো হয়েছিল। এর প্রত্যেকটিতে এক একটি কাহিনী দৃশ্য আঁকা আছে।

মিঃ হিলটনকে বললাম—এত সুন্দর সুন্দর ঘর, এত জিনিষ দেখছি কিন্তু সব মনে রাখতে পারব না এটাই দুঃখের।

—চলুন এবার অন্য ঘরে যাই।

একটু হাঁটার পর বাঁদিকে বেঁকে যে ঘরে এলাম তার নাম জর্জেস হল। ঘর বলব না ঢাকা বারাণ্ডা বলব জানি না। ঘরটি তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময়ে করা। পরে চতুর্থ জর্জের সময় উইটভিল এটির দৈর্ঘ প্রায় দ্বিগুণ করেন। দেওয়ালের গায়ে নাইটদের নিজস্ব স্মরকচিহ্ন অস্ত্র দিয়ে সাজান। আর রয়েছে রাজপরিবারের অনেকের আবক্ষ মর্মর মূর্তি।

পাশেই কুইন্স গার্ড চেম্বার। অন্যান্য অস্ত্রাগারগুলির মত এটিতে বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজান।

এরপর প্রবেশ করলাম কুইন্স প্রেসেন্স চেম্বারে, প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ছাতের পেন্টিং। মনে হলো যেন এই ধরনের গ্রীক-রোমান দেবদেবীর ছবি আমি দেখেছি। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, হ্যামটন কোর্ট প্যালেসে দেখেছি। নিশ্চয় হবার জন্যে মিঃ হিলটনকে প্রশ্ন করি—আচ্ছা এই সব ছবি কি এ্যান্টনিও ভেরিওর আঁকা?

তিনি একটু যেন আশ্চর্য হলেন, তারিফ করার মত বললেন—বাঃ আপনি তো ঠিক ধরেছেন। রাজা দ্বিতীয় চার্লস একজন ইটালীয় শিল্পী (এ্যাণ্টনিও ভেরিও) কে এনেছিলেন। তিনিই এটি এঁকেছেন। তাঁর শিল্প কর্মের আরও নিদর্শন আছে এই প্রাসাদে। কিন্তু প্রাসাদ সংস্কারের সময় অন্যান্য ঘরের ছাতের কাজ নষ্ট হয়ে গেছে।

শ্বেতপাথরের ফায়ার প্লেসটি দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম—এত সুন্দর পাথরের কাজ, এটিও কি ইটালীর?

—না, এই জিনিষটি চতুর্থ উইলিয়াম বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে আনিয়েছিলেন। ফায়ার প্লেসটির নক্সা করেছিলেন রবার্ট এ্যাডম আর তৈরী করেছেন জে. ব্যাকন। রাজ পরিবারের যে সব ছবি রয়েছে তার পাশের কাঠের কাজগুলি করেছেন গ্রিনলিং গিবসন।

—দেওয়ালে টাঙ্গান কার্পেটের ছবিগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এগুলো কোথাকার?

—ফ্রান্সের। চলুন এবার যাই 'দি কুইন্স অডিয়েন্স চেম্বারে।'

ঘরে ঢুকেই তাকালাম ছাতের দিকে। এ্যাণ্টানিও ভেরিওয় আঁকা ছবি।

মিঃ হিলটন বললেন—রানী ক্যাথেরিন, এ ঘরের সিংহাসনে বসে সকলের সঙ্গে দেখা করতেন। ঘরটি নিখুঁতভাবে সাজান।

পাশের ঘরটির নাম দি কুইন্স বল্‌রুম। ব্রাগাঞ্জার রানী ক্যাথেরিন এই ঘরটিকে নাচ ঘর করেছিলেন। সেই থেকে নাম হলো 'বলরুম।' পরে অবশ্য চতুর্থ জর্জের সময় এর অনেক পরিবর্তন হয়। কারুকার্য করা নীল সাটিনের কাপড় দিয়ে ঘরের দেওয়াল মোড়া, ছাতে প্লাস্টারের কাজ, ঝাড়বাতি ইত্যাদি সবই রাজকীয়।

আমি প্রশ্ন করলাম—এটাতো নাচঘর কিন্তু যেভাবে সাজান রয়েছে তাতে মনে হয় বসার ঘর।

—এটা ছিল নাচঘর অর্থাৎ বলরুম। পরে চতুর্থ জর্জ ঘরটিকে অন্যভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। এই সম্বন্ধে একজনের কাছে গল্প শুনেছিলাম একটা, বেশ মজার।

—কি কথা।

—ঘরটি করা হয়েছিল রানী ক্যাথেরিনের জন্যে। করিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস, তাঁর স্ত্রীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে।

—খুব ভাল লোক ছিলেন তো ?

—সে কথা পরে বলছি। রাজা চার্লস যখন সিংহাসনে এলেন তখন রাজকোষের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়, তারপর রাজা নিজেও ছিলেন অমিতব্যায়ি। তাই অন্যায় পথে তিনি অনেক সময় টাকা নিতেন, ফ্রান্সের কাছে জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, আরও অনেক কিছু করেছিলেন যেটা দেশের সম্মানের পরিপন্থি। শেষে ডাচ রাজকন্যা ক্যাথেরিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো, সেই সূত্রে ৩০০,০০০ পাউণ্ড যৌতুক পেলেন, আর পেলেন ভারতের বোম্বাই শহর। মোট কথা এই অর্থ পাওয়াতে তাঁর অসম্মান হলো না। সেই আনন্দেই বোধহয় অথবা স্ত্রীকে খুশী রাখার জন্যে তিনি এই ঘরটি করালেন।

এরপর প্রায় দুশ বছর হয়ে এসেছে, চতুর্থ জর্জ সংস্কার কাজে হাত দিলেন। তাঁর সব কাজ দেখাশোনা করতেন উইটভিল্। যখন তিনি বলরুমের কাজ করাচ্ছিলেন, সেই সময় এক রাতে তিনি এখানেই ছিলেন, পাশে ছোট একটা কামরায়। মাঝরাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘোরের মধ্যেই শুনলেন গানের সুর। আশ্চর্য হলেন, এই রাতে কে গান করছে! আরও ভাল করে কান পাততে শুনলেন যেন নাচ হচ্ছে। অবাক কাণ্ড! উঠে পড়লেন। শব্দ অনুসরণ করে চললেন।

এলেন পাশের ঘরে। সেখানে তখন মিস্ত্রিদের সিঁড়ি বাঁধা, ধূলো বালি ইত্যাদি ছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে উইটভিল দেখলেন ভোজবাজির মত সেই ভাঙ্গা-চোরা ঘরের জায়গায় ফিরে এসেছে আগের সাজান বলরুম, আর সেখানে চলেছে উদ্দাম নাচ। তিনি ঘরে আসার পরই সবাই, কে কোন দিকে চলে গেল, ঘর ফাঁকা, শুধু ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক সুসজ্জিতা, সুন্দরী মহিলা।

মিঃ উইট ভিল এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে, কিন্তু মহিলা ভ্রূক্ষেপই করলেন না। বাধ্য হয়ে উইটভিল ডাকলেম—শুনছেন, আপনারা কারা ?

নিরুত্তর। রাত নিঝুম।

আবার প্রশ্ন করলেন—এত রাতে এখানে এলেন কেমন করে ? আপনি কে ?

মহিলা মুখ তুলে বললেন—জেনে লাভ কি আমার পরিচয় ? কি পেয়েছি আমি ?

—দেখুন, আপনার কোন পরিচয়ই আমি জানি না। সেজন্যে আপনার সুখ দুঃখ জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই খুব দুঃখি নন, তা হলে এমন করে নাচতে পারতেন না।

উইটভিলের কথা যেন তাকে আঘাত করল, বলল—"দুঃখ না থাকলেই বুঝি মানুষ গান করে বা নাচে? দুঃখ ভোলার জন্যে নেশা করে, একথা কি তুমি জান না? নাচ আমার নেশা, আমি ভুলে থাকি।

—হতে পারে, আমি তো তোমার কথা কিছু জানি না। তবে এ ঘরে তুমি এলে কি করে আর এলেই বা কেন?

—এ ঘর যে আমার প্রাণ। তাও তো তোমরা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছ দেখছি। যদি তোমরা আমার ব্যথা জানতে তা হলে কখনই ঘরটা নিতে না। এসো তোমাকে আমার কথা শোনাই।

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে উইটভিলের মোটেই ইচ্ছা করছিল না অপরিচিতার কাহিনী শুনতে, কিন্তু নিরুপায়। বলল—চলুন বসি।

দুটি সোফায় বসল দুজন। মহিলা সুরু করে—ডাচ দেশের মেয়ে আমি। বড় আদরের সন্তান। অনেক আশা নিয়ে বাবা বিয়ের ঠিক করলেন। সুপুরুষ স্বামী, বুদ্ধিমান, কথার কি চমক। ওর কথায় মুগ্ধ হলাম। স্বামীর বাড়ি এসে ক্রমে ক্রমে জানলাম। তিমি মুগ্ধ করেছেন অনেক মহিলাকে তার। মধ্যে তেরোজন প্রধান। তাদের মধ্যেও আবার তিনজন বলতে গেলে আমার মতই তাঁর স্ত্রী। নাম বললে হয়তো চিনবে।

—কি নাম তাঁদের।

—একজন লুসি ওয়ালটার, এর ছেলে জেমস মনমাউথের ডিভক হয়েছিল। দ্বিতীয়জন বারবারা ভিলিয়ার্স, পরে ক্যাসলেমেনের কাউন্টেস হয়েছিল। তৃতীয় জনকে তো সবাই চেনে নেল জিন। কি চিনতে পারলে?

উইটভিল অনেক ভাবলেন, নেল জিন নামটা যেন কোথাও শুনেছেন, আর কোন নাম চিনতে পারলেন না। একটু লজ্জিত ভাবেই জানালেন, তিনি চিনতে পারেননি। তারপর বললেন—এবার আপনার নামটা বলুন।

—নাম বলার আগে একটা অনুরোধ করব বল রাখবে।

—যদি রাখার মত হয় তবে নিশ্চয়ই রাখব। বলুন শুনি।

—জীবনে স্বামীকে তো নিজের করে পাইনি, ঘর পেয়েছিলাম, তাই অনুরোধ করব ঘর থেকে আমার নাম মুছে দিও না।

—কিন্তু আপনার নামই তো বললেন না।

—আমি কুইন ক্যাথেরিন অফ ব্রাগাঞ্জা।

মিঃ উইটভিল কিন্তু ভয় পেলেন না একটুও, তিনি পালটা প্রশ্ন করতে গেলেন কিন্তু দেখলেন পাশে কেউ নেই।

সেই থেকে ঘরটির নাম বলরুমই থেকে গেছে। চলুন এবার ঘরের ছবিগুলো দেখাই। চতুর্থ জর্জ যখন এই ঘরটিকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি ছবি টাঙ্গিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে তিনকন্যার ছবিটি দেখার মত। ছবিটি এঁকেছেন জন সিঙ্গল টন। তৃতীয় জর্জের তিন বালিকা কন্যা, মেরী, এ্যামেলিয়া আর সোফিয়ার পেণ্টিংটি সত্যিই বড় আকর্ষণীয়। এটি ভিন্নও অন্য অনেক পেণ্টিং রয়েছে, প্রতিটিই মধ্যে বৈচিত্র আর সৌন্দর্য রয়েছে।

এবার এলাম রানীদের সাজ ঘরে। শুনলাম এর ছাতে এ্যাণ্টনিও ভেরিওর আঁকা ছবি ছিল। কিন্তু যে বার এখানে অগ্নিকাণ্ড হয় সেবার সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ঘরের দেওয়াল লাল রং এর সিল্ক দিয়ে মোড়া। ছবি, ঝাড়, কার্পেট ইত্যাদি অন্যান্য সব ঘরের মতই রয়েছে।

এরপর এক এক করে দেখলাম রাজার ঘর, রাজার সাজঘর, রাজার শয়ন কক্ষ। শোবার ঘরটি ছিল রাজা দ্বিতীয় চার্লসের। চতুর্দশ লুইএর সময় খাটটি তৈরী হয়েছিল। ১৮৫৫ সালে যখন তৃতীয় নেপোলিয়ান এবং সাম্রাজ্ঞী ইউজেনি উইণ্ডসরে বেড়াতে এসেছিলেন তখন এই খাটে শুয়েছেন। পাশেই রাজার বসার ঘর। প্রত্যেকটি ঘরই সুসজ্জিত।

রাজার খাবার ঘরটি বৈচিত্রপূর্ণ। এর ছাতে এ্যাণ্টনিও ভেরিওর পেণ্টিং, গ্রিনলিং গিবসনের কাঠের কাজ। আমার মনে হলো গিবসনের যতগুলি কাজ আমি দেখেছি, এটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাটালির সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে জীবন্ত করে তুলেছেন, ফল, ফুল, মাছ ইত্যাদি। আর ভেরিও এঁকেছেন দেবতাদের ভোজসভার দৃশ্য। ঘরটি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের জন্য করা হয়েছিল। অবশ্য অন্যান্য রাজারাও ব্যবহার করেছেন। চার্লসের সময় বিশেষ বিশেষ দিনে এখানে ভোজ দেওয়া হতো। সেই সব উৎসবে রাজার ভোজ খাওয়া দেখতে আসতেন রাজার স্নেহধন্য মানুষরা। সেজন্য ঘরটিকে বলা হতো 'দি কিংস পাবলিক ডাইনিংরুম।'

ঘরের পেন্টিংগুলি সুন্দর। প্রথমেই বলতে হয় কুইন ক্যাথেরিন অফ ব্রাগাঞ্জার ছবি, এঁকেছেন লুইসম্যান। ছবিটির ধারে গ্রিনলিং গিবসনের কাঠের কাজ ঘিরে আছে ছবিটিকে। আর একটি পেন্টিং, একজন চৈনিকের,

অনবদ্য। ছবিটি এঁকেছেন নেলার। রাজা দ্বিতীয় জেমসের সময়ে আঁকা হয়েছিল।

রাজবাড়ীর দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই রইল বাকী, কিন্তু চলে এলাম সেণ্ট জর্জেস চ্যাপেলে, কারণ, নেই যে বাকী সময় আমার। ফিরতে হবে।

উইণ্ডসার ক্যাসেলের লোয়ার ওয়ার্ডে সেণ্ট জর্জেস চ্যাপেলটি। একাদশ শতাব্দীতে প্রথম এর সৃষ্টি। তখন এখানে সৈন্যদের থাকা বা প্রয়োজনে রাজাও থাকতেন। এরপর ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় হেনরী এটিকে চ্যাপেলের রূপ দেন। তখন এটি সেণ্ট এডওয়ার্ড দি কনফেসারের নামে উৎসর্গ করা হয়। ১৩৪৮ সালে তৃতীয় এডওয়ার্ড ঘোষণা করলেন এই চ্যাপেলের মাধ্যমেই সৌহার্দ এবং সম্প্রীতি বাড়াতে হবে এবং এখানে নাইটদের কলেজ করলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই চ্যাপেলটি ভার্জিন মেরী, সেণ্ট জর্জ আর সেণ্ট এডওয়ার্ডের নামে উৎসর্গ করলেন। একটি 'ক্লার্জি' গোষ্ঠীর উপর চ্যাপেল রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

চ্যাপেলের সংস্কার কাজ যখন হলো তখন এটিকে কলেজিয়েট চার্চ করা হলো। ক্রমশঃ প্রার্থনাগারটি সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর পূণ্য স্থান হয়ে উঠল। এখানে মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই। এখানকার ধর্ম সংগীত বৈশিষ্টের দাবী রাখে। সমবেত ভাবে গান করার ব্যবস্থা, অথবা রাজা রানীদের বসার জায়গা দর্শনীয়। 'কয়ার' তৈরী করা সুরু হয় ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৪৮৪ সালে।

চ্যাপেলটির মধ্যে রয়েছে রঙিন কাঁচের জানলা, পাথরের মূর্তি, তৃতীয় হেনরীর সময়কার বিশাল ফটক। যে সব রাজা রানীদের এখানে সমাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের মর্মর মূর্তি রয়েছে তাঁদের সমাধির উপর।

সমাধিগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো অষ্টম হেনরীর সমাধিটি দেখব। বললাম মিঃ হিলটন কে, অষ্টম হেনরীর সমাধিটা একবার দেখবো।

গেলাম দেখতে। বিশেষত্ব কিছুই নেই কিন্তু মিঃ হিলটনের কাছে সেই তুষার ঝরা রাতের কথা মনে পড়াতেই শরীরে কেমন যেন রোমাঞ্চ হলো। যাই হক ফেরার তাড়ায় আর দাঁড়াইনি চলে এসেছিলাম সেদিন।

কেনউড হাউস পর্ব

হ্যামস্টেডেএর কাছাকাছিই থাকতাম। প্রতিবেশীদের কাছে শুনলাম কেনউড হাউসের কথা। তার সঙ্গে আরও শুনলাম রোমাঞ্চকর গল্প। মিসেস ডেলটনের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছিল বেশী। তিনিই বললেন—চল একদিন তোমাকে ঐ প্রাসাদে নিয়ে যাব, কত যে সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে দেখার কি আর বলব! সেই সঙ্গে আর একটি বাড়ীতেও নিয়ে যাব।

—সেটাও কি প্রাসাদ?

—না, তা নয় তবে খুবই কৌতূহল জাগায়।

গেলাম একদিন। অল্প সময় লাগল পৌঁছাতে। বাড়ী ভাল ঠিকই কিন্তু মুগ্ধ হলাম এর বাগান দেখে। মিসেস ডেলটনকে বললাম—বাড়ি আর কি দেখব, তার থেকে চলুন বাগান দেখি।

উত্তরে মিসেস ডেলটন বললেন—বাগান তো দেখবই, চল তার আগে বাড়ি দেখে নিই। সেই সঙ্গে বাড়ির কাহিনী বলব।

বললাম—আপনি যে আর একটি বাড়ির কথা বলেছিলেন, সেটা কখন যাব।

—এত অধৈর্য হলে কি চলে? আগে এই বাড়ি দেখা শেষ কর তারপর ঐ বাড়িতে নিয়ে যাব। এই যে বাড়িটা দেখছ এটা অনেক হাত ফের হয়েছে। এটির পত্তন করেন জন বিল নামে একজন, এখন থেকে অনেক দিন আগে প্রায় ১৬১৬ সালে। অবশ্য বেশী দিন বিল পরিবারের হাতে ছিল না, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কেনউড যায় চলে ব্রুক ব্রিজ নামে একজনের কাছে।

ব্রিজ আবার সম্পত্তিটি বিক্রি করলেন লণ্ডনের এক ব্যবসায়ী, নাম জন ওয়ালটারের কাছে মাত্র সাত বছর তিনি জমিটি রাখাতে পারলেন। তারপরই স্ট্র্যাটনের চতুর্থ আর্ল উইলিয়ামকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এত সুন্দর বাড়িটি কেউই ধরে রাখতে পারছিলেন না। উইলিয়ামও কেনার অল্প দিন পরেই বেশী লাভে ডিউক অফ আরগিলকে বিক্রি করলেন। ডিউক ছিলেন স্পেনের রাষ্ট্রদূত আর সেনাপতি। তবু তিনিও জমিটি নিজের কাছে বেশীদিন রাখতে পারলেন না। ১৭১৫ সালে ডিউক

বাড়িটি তাঁর ভাই লর্ড লে আর ভগ্নিপতি বুটের দ্বিতীয় আর্লকে বিক্রি করলেন।

পাঁচ বছর তাঁরা জমিটি রেখেছিলেন নিজেদের কাছে। এই সময়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে নানান কথা উঠেছে, কেউ বলে স্থানটির ওপর অশরীরির প্রভাব আছে তাই কেউ সহ্য করতে পারে না। আবার কেউ বলে এখানকার জঙ্গলে (তখন সেখানে বাগান, পুকুর ইত্যাদি হয়েছে) নাকি ডাকিনীসিদ্ধ কতকগুলি লোক থাকত, তারা এই বাড়ি আর জমি গ্রাস করতে চাইত তাই নতুন কেউ বাড়ি কিনলেই ভয় দেখাত, বাধ্য হয়ে বাড়ি বিক্রি করে চলে যেত। লর্ড লে এবং দ্বিতীয় আর্ল স্থির করলেন যাই হক না কেন বাড়ি বিক্রি করবেন না। কিন্তু সম্ভব হলো না।

এতক্ষণ মিসেস ডেলটনের কথা শুনে প্রশ্ন করলাম—কারা ভয় দেখায় বা কেন ভয় দেখায় তার খোঁজ কি কেউ নেন নি?

—নিশ্চয় নিয়েছেন। পরে সে কথা বলছি। আগে ঘটনাগুলি বলে নিচ্ছি।

—বলুন না, থামলেন কেন?

নানান অস্বস্তিতে ভুগে দ্বিতীয় আর্ল এবং লর্ড লে বাড়িটা বিক্রি করবেন বলে ঠিক করলেন। কিছুদিনের মধ্যে উইলিয়াম ডেলকে দ্বিতীয় আর্ল আর লর্ডলে জমিটা বিক্রি করলেন। মিঃ ডেল ছিলেন ইংলণ্ডের একজন ধনী লোক। জমি বিক্রয় করার পরই উইলিয়ামের অনেক টাকা হঠাৎ লোকসান হয়ে গেল। তখন উইলিয়াম অর্থের জন্য অনেক ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন, কোথাও না পেয়ে বাধ্য হয়ে লর্ড লের কাছে বাড়িটি বন্ধক রাখলেন।

কেনউড হাউস হাতে আসার পর লর্ড লের নানান অসুবিধা হতে থাকে। তখন তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, কেন এমন হচ্ছে? নিশ্চয় এর কোন ইতিহাস আছে। তিনি অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারলেন এক অভূত-পূর্ব কাহিনী। অথচ তার সঙ্গে এই বাড়ির সরাসরি কোন যোগ নেই।

ঘটনাটা এই রকম—চতুর্দশ শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডে স্যার জন পোএর নামে একজন গণ্যমান্য লোক থাকতেন তাঁর সঙ্গে কিলকারনির লেডি এলিস কিটলারের বিয়ে হলো। সুস্থ সবল জন পো এর পর থেকে কেমন যেন শুকিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর অনুগত ভৃত্যদের মধ্যে কুপার নামে একজন ছিল। সে প্রভুকে খুব ভালবাসত। একদিন সে বলল—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।

অভয় দিয়ে মনিব বললেন—বল না, কি বলতে চাও।

—প্রভু, আমার অপরাধ নেবেন না, আমাদের কর্ত্রীকে আমার সন্দেহ হয়।

জন বেশ রাগত স্বরে বললেন—আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমার কাছে আমারই স্ত্রীর সম্বন্ধে নিন্দা করছ! ধৃষ্টতা তো বড কম নয়।

কুপার বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, বলল—ঐ জন্যে আগেই মাপ চেয়ে নিয়েছি। আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন না, উনি যদি ভাল মানুষ হতেন তবে কি পর পর তিনজন স্বামী মারা যেতে পারে?

প্রতিবাদে করলেন জন—কত মেয়েরই তিন চারজন স্বামী মারা যায়, তাতে কি হয়েছে, স্ত্রীর দোষ কোথায়? আর এলিসের মত এখন মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে দেখাই যায় না···ছি, ছি, কি যে বল।

জনের কথায় কুপার যে বিশেষ প্রভাবিত হল তা মনে হয় না। সে বলল—নিশ্চয় তিন চারজন মারা যেতে পারে কিন্তু তিন জনেই রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন, এটা কি অদ্ভুত নয়?

—কি ভাবে মারা গেছেন? আমি কিছুই জানি না এ ব্যাপারে।

—বলছি শুনুন, প্রথম স্বামীকে নিয়ে মিসেস এ্যালিস গিয়েছিলেন পাহাড়ে বেড়াতে, স্কটল্যাণ্ডে সপ্তাহখানেক আনন্দে কাটল। একদিন সকালে দেখা গেল স্বামী কোথায় চলে গেছেন। এ্যালিস অনেক কান্নাকাটি করলেন। শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে এলেন। শুনলেন যেদিন সকালে স্বামী নিখোঁজ সেদিন সকালেই তাঁর হ্যাটফিল্ডের বাড়ির বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। স্কটল্যাণ্ড থেকে তাঁর বাড়ী আসতে কমপক্ষে একদিন সময় লাগে, অথচ কয়েক ঘণ্টায় এলেন কি করে, আর বাড়ির লোক জানতেই বা পারল না কেন?

জন বিশ্বাস করলেন না, বললেন—নিশ্চয় কিছু বদমায়েশ লোক এই সব করেছে।

কুপারও বিশ্বাস করাবেই, বলল—দ্বিতীয় স্বামীও ধনী এবং ভাল মানুষ ছিলেন। মিসেস এ্যালিস তাঁকে দিয়ে উইল করিয়ে নিলেন এমন ভাবে যাতে স্বামীর মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি তাঁরই হয়। উইল করাও শেষ হলো আর ভদ্রলোক মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা গেলেন।

স্যার পোলার বললেন—দেখ হয়তো তার যক্ষা ছিল, কার্য কারণে উইল শেষ হবার পরই তাঁর মৃত্যু হলো।

—তাই না হয় হলো। তৃতীয়টির বেলার কথা তো অস্বীকার করার নয়।

—কি হয়েছিল তাঁর।

—যথারীতি বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন। বেশ কাটল, তারপরই উইল করাবার জন্য জোর করলেন মিসেস এ্যালিস! এ স্বামী লোক ভাল হলেও ভালমানুষ ছিলেন না, তিনি বললেন, এত তাড়ার আছে কি? উইল পরে করব।

এই নিয়ে মন কশাকষি চলল। শেষে একদিন স্ত্রী বললেন যদি তুমি সম্পত্তি আমার নামে না লিখে দাও তবে ফল খুব খারাপ হবে। বিরক্ত স্বামী বললেন—ঠিক আছে যা পার কর। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী অনুভব করলেন তাঁর গলা কেউ সজোরে চেপে ধরেছে, কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। সেই সময় তাঁর এক আত্মীয় ঘরে ঢুকে দেখেন গলায় ফাঁস দিয়ে টানলে মুখের যেমন অবস্থায় তেমনি তাঁর অবস্থা, অথচ মিসেস এ্যালিস ছাড়া ঘরে কেউ নেই, তাও তিনি অনেক দূরেই বসে ছিলেন। তবে কে তাঁর গলা টিপছিল? শুধু গলা টেপা নয়, কতকটা শূন্যে তুলে কে যেন তাঁকে আছড়ে ফেলে দিল। বলুন, এ মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন?

এবার স্যার পো-এর চিন্তিত হলেন। বললেন—কি করা যায় বল তো?

কুপার বলে—প্রভু, আপনি, লেডি এ্যালিসের দেওয়া কোন ওষুধ খাবেন না। বা তাঁর দেওয়া কোন মলম মাখবেন না।

—এ কথা বলছ কেন?

—আমার সন্দেহ, ঐ সঙ্গে আপনাকে তুক করছে বা বিষ দিচ্ছে।

—সন্দেহের কারণ কি?

—প্রভু, আমাকে দোষ দেবেন না, আমিও কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানি, তাতেই বুঝেছি। আমি চেষ্টা করছি এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

অসুস্থ স্যার পোএর ক্লান্ত ভাবে বললেন—দেখ চেষ্টা করে।

কুপার নিজের মন্ত্রের জোরে এ্যালিসের এক গোপন বাক্স খুলে ফেলে। যে বাক্সকে এ্যালিস বলত ওষুধের বাক্স। কুপার বাক্স খুলে তার ভিতরকার জিনিষ দেখে ভয় পেয়ে গেল, দেখল তাতে রয়েছে মড়ার হাড়, মাথার ঘিলু, নোখ, মুরগীর বিষ্ঠা, নানা জাতের পোকা, গাছের শিকড়, এ ছাড়া এক ডাকাতের মাথাও রয়েছে, যার কয়েকদিন আগে শিরশ্ছেদ হয়েছিল। এ্যালিস এই সব জিনিষ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে, সেটি ওষুধ বলে খেতে দিত।

অসুস্থ স্যার জন সব জানলেন। তাঁর নিজের করার কোন ক্ষমতা ছিল না।

সেজন্যে স্থানীয় বিশপকে সব জানালেন। ধর্মযাজক তখনই ঘটনাটির তদন্তের ব্যবস্থা করলেন এবং জানতে পারলেন এ্যালিস একটি দুষ্টু দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যাদের কাজ মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা বা হত্যা করা। এ্যালিস নিজেও পিশাচ সিদ্ধ।

বিশপ উঠে পড়ে লাগলেন এ্যালিসকে শাস্তি দিতে কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে তিনি এই জায়গার নবাগত ছিলেন। অপর দিকে স্যার পোলএর সম্মানে এ্যালিসও সম্মানিত ছিল এবং সেই সূত্রে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ফলে বিশপ বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। বিশপ কিছু করতে না পারলেও এ্যালিস স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে তার সব গুপ্ত ঘটনা জানাজানি হয়ে গেছে। সেজন্যে সে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে আর তখন এরই কাছাকাছি জায়গায় ছিল। সেই সময় তার সেই তুক-তাক করার জিনিষগুলি ফেলে দিল এই পুকুরে। বেশ কিছুদিন কিছু হয়নি, তারপর থেকেই কিছু না কিছু অনিষ্ট হয়েই চলে।

এতক্ষণ সব শুনে আমি প্রশ্ন করি—এ্যালিস তো পালিয়ে এলো, বাকীদের কি হলো?

—বাকীদের মধ্যে এ্যালিসের যে খাস সঙ্গিনী সেই নিজে গিয়ে ধরা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। আর অন্যদের শাস্তি দিয়েছিল। বিশপ এই রকম অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নিজে চলে গিয়েছিলেন রোমে।

—স্যার জন পোএর কি হলো?

—আস্তে আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে বাকী জীবন শান্তিতে কাটিয়েছিলেন।

একটু থেমে মিসেস ডেলটন বললেন,—এবার ফিরে যাই লর্ড লের কথায়। তিনি অতীতের সব ঘটনা জেনে নিয়ে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে বাড়িটিকে পবিত্র করে তোলেন। তারপর থেকে এখানে আর অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটেনি। এরপরের ঘটনা ঘটল ১৭৫৪ সালের পর।

—এই যে আপনি বললেন আর কোন অশান্তি হয়নি এখানে।

—এখানে কোন অশান্তি হয়নি তবে এখানকার মানুষকে নিয়ে অশান্তি হয়েছিল।

—সেও কি ম্যাজিক জাতীয় কিছু?

—ঠিক তা নয়। ঘটনা বললেই বুঝবে। ১৭৫৪ সালে কেনউড হাউস

এলো বুটের তৃতীয় আর্লের হাতে। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল প্রিন্স অফ ওয়েলসের। যিনি পরবর্তীকালে রাজা তৃতীয় জর্জ হয়েছিলেন। রাজা হবার পর আর্লের ক্ষমতা বেড়ে গেল বলাই বাহুল্য। তাঁর নাম ছিল জন স্টুয়ার্ট। তিনি রাজাকে অনেক ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। ১৭৬২-৬৩ সালে তিনি রাজার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজা তৃতীয় জর্জের শরীরে অনেক গুণ ছিল। তিনি দেশের ভাল করার চেষ্টাও করতেন কিন্তু পরিস্থিতি তাঁর সব ইচ্ছাপূরণ করেনি। জন স্টুয়ার্ট তাঁকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন কি ভাবে পার্লামেন্টের বশ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন এভাবে চলে বেশ ফলই হয়েছিল, কিন্তু স্থায়ী হয়নি। জনের মন্ত্রীত্ব কালেই সাত বছরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

রাজা তৃতীয় বিয়ে করেছিলেন মেকলেন বার্গে রাজকন্যা চারলটিকে। পত্নী প্রেমিক রাজা পনেরোটি সন্তানের জনক হলেন, তার মধ্যে নয়টি পুত্র ছয়টি কন্যা। এই নিয়েই সুরু হয়েছিল অশান্তি—কে পাবে সিংহাসন। সে অন্য ইতিহাস, আমাদের বর্তমানে তার কোন দরকার নেই। কেনউড হাউসের ব্যাপারে যাঁর দরকার তাঁর কথাই বলি। জন স্টুয়ার্ট রাজদরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকেও তাঁর প্রভাব বেড়ে যেতে থাকে। রাজকন্যা মারিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। কিম্বা বলা চলে রাজকন্যাদের নজর তাঁর প্রতি পড়ে। বড় বাড়ির বড় ব্যাপার। কথাটা কানাঘুষো হতে হতে রাষ্ট্র হয়ে যায়। জন স্টুয়ার্ট মারিয়াকে নিয়ে চলে যান রচেস্টার। মারিয়ার বয়স তখন নেহাৎই কম। জন ভাড়া নিলেন একটি বাড়ি, সেটাকে ছোটখাট প্রাসাদও বলা যায়। এটাই তোমাকে দেব বলছিলাম।

বাড়িতে আসার পর থেকে জন এবং মারিয়ার মনে কেমন একটা অনুভূতি হতে থাকে। জন ভাবলেন দেশে তাঁদের নিয়ে যে গুঞ্জন উঠেছে তার জন্যই এই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু রাত যত গভীর হতে থাকে ভয় ততই ঘিরে ধরতে থাকে। বিশেষ করে জনকে যেন সর্বদা কেউ চোখে চোখে রেখেছে এই কথাই মনে হয়। মারিয়ার কাছাকাছি গেলেই মনে হয় কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। জনের মনে জেদ চেপে গেল। সে রাজাকে জয় করেছে আর অশরীরিকে ভয় করবে! কিন্তু হার হলো।

তিনি তখন বাড়িটির সম্বন্ধে খবর নিতে লাগলেন। জানতে পারলেন তাঁরা ভাড়া নেবার বছর দশ বারো আগে এখানে বেলভেডিয়ারের আর্ল ভাড়া

থাকতেন। তিনি ছিলেন রাজা দ্বিতীয় জর্জের স্নেহধন্য। বুদ্ধিমান, সুদর্শন এই আর্লের বিয়ে হলেও কম বয়সেই পত্নী বিয়োগ হয়। বহুদিন আর বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, যদিও তাঁর প্রচুর বান্ধবী ছিল। যখন তাঁর বয়স প্রৌঢ়ত্বকে ছুঁই ছুঁই করছে তখন মিস মসেল ওয়ার্থ নামে এক ষোড়শীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শান্ত স্বভাবের মসেল ওয়ার্থের আর্লকে ভাল লাগলেও তাঁকে বিয়ে করার কথা চিন্তাই করেনি। কিন্তু আর্ল বারে বারে অনুরোধ করায় শেষ পর্য্যন্ত সে বিয়েতে সম্মতি দেয়।

বিয়ের পর আর্ল স্ত্রীকে এই বাড়িতে এনে রাখল। মসেল ওয়ার্থ অনুভব করে তাঁর স্বামীর আকর্ষণ দ্রুততার উপর থেকে চলে যাচ্ছে। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি থাকেন অন্যত্র। এক বছর বাদে তাদের এক কন্যা জন্মাল, ফলে আর্ল আরও বিরক্ত হলেন। তাঁর আশা ছিল পুত্র সন্তান হবে। আর এক বছর বাদে একটি ছেলে হলো। কিছু সময়ের জন্যে আর্ল খুশী হলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীপুত্রের কাছে আসা কমে যেতে লাগল। আর যখনও আসতেন তখনও থাকতেন সন্দেহের একটা আবরণ নিয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। সেজন্যে তিনি এলে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা এস্ত হয়ে থাকত। মাসেলওয়ার্থ বুঝতেন তার স্বামীর কানে বিষ ঢালছে আর্লের বান্ধবীরা।

যা হক এমনি করেই চলছিল হঠাৎ একবার এসে আর্ল তার স্ত্রীকে বলল—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমি অনেক অপবাদ শুনেছি।

এতদিন পরে নির্যাতন সহ্য করে করে মসেল বলে উঠল—কি শুনেছ আমার সম্বন্ধে? লজ্জা করে না স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্য কর না আবার মিথ্যা অপবাদ দিতে এসেছ।

আর্ল বললেন—পাশের বাড়ি তুমি কেন যাও তা কি কেউ জানে না। ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক আছে।

এই কথা শুনে মসেল ঘৃণায় নির্বাক হয়ে গেল। পাশের বাড়ি সে যায় কারণ তারা খুব ভাল এবং সহৃদয়। যার নামে আর্ল এত বড় অপবাদ দিল সেই মানুষটি সত্যিই দেবতুল্য। মসেল কোন উত্তর না দিয়ে মনস্থির করল বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। কিন্তু ক্ষমতাবান আর্ল স্ত্রীকে বন্দী করেই ফেললেন। উপরন্তু সেই ভদ্রলোককে দেশ ছাড়া করলেন। দেশে থাকলে তাকে প্রচুর টাকা জরিমানা দিতে হবে। ভদ্রলোক জরিমানার অর্থ দিতে পারবেন না ভেবে দেশ ত্যাগ করলেন।

দিন কাটে। মসেল বন্দী হয়ে আছে, যত দিন যায় ততই তার উপর অত্যাচার বাড়ে। সেই ভদ্রলোক ভাবলেন, সময়ই সব থেকে বড় সান্ত্বনা, এতদিনে নিশ্চয় আর্ল তাঁর শাস্তির কথা ভুলে গেছেন। মনে আশা নিয়ে ফিরলেন। আর্ল ভোলেননি কিছুই, ভদ্রলোক দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। লজ্জার, দুঃখে ভদ্রলোক অল্প দিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

মসেল ওয়ার্থের দুর্গতি তখন চরমে উঠল যখন তার সন্তানদের সঙ্গে দেখা হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। একদিন সে আর পারল না এই ভীষণ মানসিক পীড়া সহ্য করতে, তাই আত্মহত্যা করল।

কাহিনীটি শুনে জন স্টুয়ার্ট ভাবলেন তাঁর বিষয়টিও অনেকটা ঐ ধরনেরই, তিনি বয়স্ক এবং মারিয়ার বয়স কম, হয়তো সেইজন্যই মসেলওয়ার্থের আত্মা তাঁকে আগলাচ্ছে। তাঁর আরও মনে হলো যে বেলভেডিয়ারের আর্ল বিপত্নীক ছিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারিয়াকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন এবং সংসারে মন দিলেন।

বুটের তৃতীয় আর্ল বিয়ে করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত বিদূষী মহিলা লেডি মেরী ওয়ার্টলে মণ্টেগুএর কন্যাকে। তাঁরা সুখেই জীবন কাটিয়েছেন। একাদিক্রমে আট বছর তাঁরা কেনউড হাউসে ছিলেন। তারপব উইলিয়াম মুরী, ম্যানস ফিল্ডের প্রথম আর্লকে সম্পত্তিটি বিক্রি করেন। তাঁরা কেনউড হাউসকে বাগান বাড়ি হিসাবে ব্যবহার করতেন, ছুটির দিন কাটাতেন। তাঁদের নিজেদের বাড়ি ছিল ব্লুমস বুরিতে। লর্ড ম্যানস ফিল্ড, স্কটল্যাণ্ডের লোক, অল্প বয়সে ইংলণ্ডে এসেছিলেন এবং এখানেই পড়াশোনা করেন। উত্তর জীবনে তিনি প্রথমে সলিসিটার জেনারেল, তারপর এ্যাটর্নী জেনারেল এবং পরে লর্ড চিফ জাষ্টিস হন।

সে সময় এ্যাডম শিল্পী হিসাবে প্রভুত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ম্যানস ফিল্ড অ্যাডামকে কেনউড হাউস নতুন করে সাজাবার ভার দেন। এ্যাডাম নিজে কাজ করছিলেন, সঙ্গে নিয়েছিলেন বন্ধু মেসকে।

১৭৮০ সালে এক উত্তেজিত জনতা ম্যাসফিল্ডের ব্লুমসবুরির বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। সেই থেকে কেনউড হাউস ম্যানসফিল্ডদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে যায়।

লেডি ম্যানসফিল্ড ১৭৮৪ সালে এখানেই মারা যান। সেই থেকে লর্ড ম্যানসফিল্ড একটি রাতের জন্যেও এ বাড়ি ছেড়ে জাননি। ১৭৯৩ সালে অল্প

দিন রোগ ভোগের পর লর্ড মারা যান। লর্ড ম্যানসফিল্ডের কোন সন্তানাদি ছিল না তাই তাঁর সম্পত্তি ভ্রাতষ্পুত্র ডেভিড মুরিকে দিয়ে যান।

ডেভিড মুরি ছিলেন গণ্যমান্য লোক। তিনি প্যারিসে রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়ে ছিলেন যখন ষোড়শ লুই আর মেরী আঁতোয়ানেত ভারসাইল প্রাসাদে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উচ্চমানের। তিনি কেনউড হাউসের গ্রাম্যভাব কাটিয়ে শহুরে বাগান বাড়ি করতে চেয়েছিলেন, তৈরী করিয়েছিলেন নাচঘর। তিনি মারা গেলেন ১৭৯৬ সালে। সম্পত্তি এলো তাঁর পুত্র তৃতীয় আর্লের হাতে। রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাই কেনউডে তাঁর প্রায় থাকাই হতো না। যদিও তিনি ৯২ বছর বয়স পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন। এরপর ম্যানসফিল্ড পরিবারে যারা এসেছিলেন তাঁর খুব কম দিনই জীবিত ছিলেন। ১৯২৫ সালে লর্ড ইভেগ ১০৭,৯০০ পাউণ্ড দিয়ে কেনউড হাউস আর সংলগ্ন ৭৪ একর জমি কিনে নেন।

লর্ড ইভেগ যখন বাড়িটি কিনলেন তখন তাঁর বয়স ৭৮ বছর। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাড়িটিকে তাঁর সংগৃহিত ছবি, মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবেন যাতে সাধারণ মানুষ এখানে বেড়াতে পারে বা দেখতে পারে। কিন্তু তিনি মাত্র ২ বছর বেঁচেছিলেন বাড়ি কেনার পর। তবে ইভেগার দ্বিতীয় আর্ল তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এটি সর্বসাধারণের জন্যে খুলে দিয়েছেন।

এতক্ষণ কেনউড হাউসের কাহিনী শুনে বললাম—চলুন বাড়ির কথা তো অনেক শুনলাম এবার বাগানটা দেখব।

—বাড়িটা ঘুরে দেখে নাও।

মিসেস ডেলটনকে অনুসরণ করলাম।

থাম দেওয়া শাদা রংএর বাড়ি দেখে হঠাৎ আমার খুব চেনা চেনা মনে হলো। একটু পরে মনে হলো বাড়ি চেনা নয়, থামগুলো চেনা। এ যেন কলকাতার মেডিকেল কলেজের থাম। ভিতরে ঢুকলাম পরিষ্কার, সাজান। মনে হয় যেন এখানে এখনও আর্লরা থাকেন। এর আগে যে সব রাজবাড়ি দেখেছি তাদের তুলনায় হয়তো তেমন কিছু নয়, তবে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। এই বাড়ির লাইব্রেরী ঘরটি বিশেষত্বের দাবী রাখে, সুন্দর গোল ছাত এবং ছাতের পেন্টিংও চমৎকার।

নেমে এসে ঘুরলাম বাগানে। দুটি লেকের মধ্যে যোগা করার একটি ছোট সেতু রয়েছে। বাগানের ধারে ধারে এভারগ্রিনট্রি, সঙ্গে ফুলের গাছ। যতদূর

দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ। মিসেস ডেলটন জানালেন এখন এখানে সাধরণের উৎসব বা সভা সমিতির জন্যে বাগান বা মাঠ ভাড়া দেওয়া হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—সেই যে আর একটা বাড়ির কথা বলেছিলেন, সেখানে যাবেন না?

—সেটার কথা তো আগেই বললাম, যাতে মসেলওয়ার্থ থাকত। সেখানে গিয়ে আর কি হবে, তার থেকে হ্যাটফিল্ড হাউসে যেও।

—তাই হবে।

ফিরে এলাম।

হ্যাটফিল্ড হাউস পর্ব

দেখব বললেই দেখা হয় না বা যাব বললেও যাওয়া হয় না। কিন্তু মনের মধ্যে হ্যাটফিল্ড হাউস দেখার বাসনা মৌমাছির মত গুন্ গুন্ করেই চলে। ইংলণ্ডের স্বর্ণ যুগের (প্রথম এলিজাবেথের সময়) স্রষ্টিকারিনীর শৈশব কুঞ্জ দেখার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। তারপরে আছে লেডি এ মিলি মেরী হিলের আর ব্রিয়ানের চমকপ্রদ কাহিনী। আকর্ষণ দুর্নিবার।

লণ্ডন থেকে দুরত্ব বেশী নয়, ১৮ মাইল মত হবে। সুবিধা, অসুবিধার বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। বাস যাত্রাটিও মনোরম। তবু তার ফাঁকে ফাঁকে পড়ে নিতে লাগলাম হ্যাটফিল্ড হাউসের ইতিহাস।

ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তা কিন্তু নয়, বইটি প্রাসাদের আত্মকথা বলা চলে। নামটিও আই অ্যামে দি হ্যাটফিল্ড হাউস, লেখকের নাম হ্যাটফিল্ড। বোঝাই যায় ছদ্মনাম। প্রথম পাতা নেই শেষও নেই, ভূমিকা থেকে আরম্ভ। সাল দেখলাম ১৮৯৪। বইএর পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে। যেদিন হ্যাটফিল্ড হাউস দেখতে যাব বলে ঠিক করেছিলাম তার আগের দিন রাতে আমাদের প্রতিবেশী মিসেস ডেলটন বইটি আমাকে দিলেন, বললেন—এটা পড়ে যদি বাড়িটি দেখ তবে আনন্দ পাবে।

বললাম—আপনি চলুন না সঙ্গে।

—আমার অবসর নেই, তাই বইটি দিলাম। তবে একটি অনুরোধ, এটি হারিয়ে ফেল না, আব খুব সন্তর্পণে ব্যবহার করো কারণ পাতাগুলো প্রায় ভুঙ্গুর হয়ে এসেছে। আমাকে ফেরৎ দিয়ে দিও।

এমন অমূল্য আর দুষ্প্রাপ্য বই পেয়ে, অনুবাদ কবার জন্যে মনটা নেচে উঠল। বললাম—ফেরৎ আমি দেব, কিন্তু আমাকে যদি অনুবাদ করার অনুমতি দেন তো দিন দশেকেব মধ্যেই অনুবাদ করে দিয়ে দিতে পারি।

মহিলা যেন আঁতকে উঠলেন—না, না, তা পারব না, যিনি আমায় দিয়েছেন তিনি বলেছেন এর অনুবাদ করা চলবে না, এমন কি পুনর্মুদ্রণও করতে পারব না, তা হলেই সর্বনাশ হবে। না হলে কি আর এটা আমি ছাপাতাম না। তুমি শুধু পড়ে নাও।

কি আর করতে পারি, যথা লাভ ভেবে বইটি পডে নিতে লাগলাম। আমি শ্রুতিধর, স্মৃতিধর কিছুই নই, যে পড়ে বা শুনে সব মনে রাখতে পারব। তবু যা বা যতটুকু মনে আছে সেটুকুই লিখে রাখছি। সেটি এই ধরনের—

ভূমিকা—আমি, আজ প্রায় ষাট বছর এ বাড়িতে আসছি, কিন্তু কখনও এমন অভিভূতি হইনি। ভয় পেয়েছি তা বলব না, আসলে ভাল লেগেছিল।

রোজই আসি হ্যাটফিল্ড হাউসে। আমার কাজ লাইব্রেরী দেখাশোনা করা। ঘরটি করেছিলেন লর্ড চেম্বারলেন, প্রথম মারকুইস। তিনি রাজা তৃতীয় জর্জের স্নেহধন্য ছিলেন। তাই হ্যাটফিল্ড হাউসকে নতুন করে সাজিয়েও ছিলেন। অবশ্য তাঁর রুচিও ছিল অন্যমানের।

' সেদিন ছিল বুধবার, জুলাই মাস। সুন্দর ঝকঝকে দিন। আলো আর সূর্যের উত্তাপ থেকে মানুষের উৎসাহ বাড়ে, সম্ভবতঃ সেইজন্যে সেদিন ভাবলাম আজ লাইব্রেরীটাকে নতুন করে সাজাব। বইএ হাত দিলে কি হয় তা বই প্রেমিক মাত্রেই জানেন। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ হয় বইটা খোলার। খুললেই দু-চার পাতা ওল্টাবেনই। তার মধ্যে কোন বই, কোন পাতা আপনাকে টেনে নেবে চুম্বকের মত, তা সে পড়া বই হক আর না পড়া বই হক। তারপর তো ঘড়ির কাঁটা চলতে লাগল নিজের গতিতে আর আপনি চলতে থাকলেন বই-এর সঙ্গে। আমারও হলো তাই, কখন যে সূর্য কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পেরলেন জানতে পারলাম না। তিনি এক সময় পশ্চিম আকাশ

রাঙিয়ে পৃথিবীর থেকে বিদায় নিলেন, জানতে পারিনি। জানলাম যখন ভৃত্য এসে ঘরের আলো জ্বালল।

সে আমাকে আবছা আলোয় বই পড়তে দেখে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—সন্ধ্যা হলো বাড়ি যাননি।

হেসে বললাম—একটা মজার জিনিষ পড়ছিলাম, এবার উঠব।

সে চলে গেল, আমি উঠে বইটি যথাস্থানে রাখতে গিয়ে উঁচু তাক থেকে এক তাড়া কি যেন পড়ে গেল, ভাবলাম বুঝি কোন বই। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে তুলতেই বুঝলাম বই নয় একটি ডাইরি এবং তার সঙ্গে এক তাড়া চিঠি। ডাইরিটা খুলে পাতা উল্টোলাম, লেখা এমনই অস্পষ্ট আর পাতা এমনই জীর্ণ হয়ে গেছে যে লেখা উদ্ধার করা বেশ কঠিন। আমি তাই চিঠি আর ডাইরিটা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে ডাইরি খুলে বসলাম।

ডাইরি—জেলখানায় বসে বসে ভাবছি নিজের কথা। ঈশ্বর তো কোন কিছু দিতেই আমাকে কার্পণ্য করেননি, কিন্তু ভোগ করার অধিকার দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন—সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন অশান্তি।

জন্মাবার আগে থেকেই কত চিন্তা। আমার মা মৃতবৎসা, কাজেই আমার আগমন সুখের হবে না দুঃখের তা কেউ বুঝতে পারছিল না। আর মাও মানসিক জোর পাচ্ছিলেন না বলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন।

আর বাবার কথা? কি বলব, বাবা কি বস্তু তা তো জানতেই পারলাম না। দেশে তখন অশান্তি, যুদ্ধ লেগে আছে তার সঙ্গে ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরীর খেয়ালীপনা। মার মুখে শুনেছি বাবা যখন জানলেন আমার পৃথিবীতে আসবার কথা তখন প্রথমটায় বড় খুশী হয়ে বলেছিলেন—যাক স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের জন্যে আর চিন্তা রইল না।

পরমুহূর্তেই ম্লান মুখে বলেছিলেন আমার ভাগ্যে কি সন্তান আছে!

এরপর যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে বেধে উঠেছিল। ক্লান্ত বাবা, মাকে নিয়ে লিনলিথগোর প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন নভেম্বর মাস। বাবার খাস বেয়ারা টম বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল—রাজবাহাদুর, এবার বড়দিন কোথায় কাটাবেন?

সেটা ছিল ১৫৪২ এর নভেম্বর।

বাবা ম্লান হেসে বললেন—ঈশ্বর যেখানে রাখবেন। তোমাদের দেশের সিংহাসন খালি হতে মনে হয় আর বেশী দেরী নেই।

ভৃত্য তার সাধারণ বুদ্ধি থেকে ভেবেছিল নিশ্চয় দেশের যুদ্ধের জন্যেই প্রভু চিন্তিত হয়ে একথা বলছেন।

কিন্তু সে বড় কঠিন সত্য ছিল।

বাবার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে আসছিল, আর লিনলিথগোতে ভাল লাগছিল না, তাই তিনি তাঁর প্রিয় ফকল্যাণ্ডের প্রাসাদে গেলেন। তাঁর জীবন দীপ যখন স্তিমিত হয়ে আসছে তখন ৮ই ডিসেম্বর খবর পেলেন যে আমার জন্ম হয়েছে। যাঁরা সুসংবাদটি এনেছিলেন তাঁরা আশা করেছিলেন রাজা পঞ্চম জেমস অন্তত এই শুনে খুশী হবেন যে সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারিণী হলো।

কিন্তু না, তিনি খবর শুনে যেন ব্যথা পেলেন, ম্লান মুখে বললেন—বিদায়, আমি যাচ্ছি, তোমরা ভাল থেকো। যে এসেছে সে যেমন হঠাৎ এসেছে তেমনি হঠাৎই চলে যাবে আনন্দের কিছু নেই।

এর ছ'দিন বাদে ১৪ই ডিসেম্বর আমার বাবা মারা গেলেন, মাত্র ত্রিশ বছরে মারা গেলেন, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে।

অশান্তি, অরাজকতা সবের মধ্যেই বড় হতে লাগলাম; তবে খুবই আদরেই ছিলাম। মা ফরাসী দেশের মেয়ে, তাই ছোট্ট বয়সেই আমাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ফরাসী আদব কায়দা শিখব বলে। সঙ্গে দিলেন লেডি ফ্লেমিং কে, আমার দেখাশোনার জন্যে। বেশ কাটছিল। লেখাপড়া, আদব কায়দা শিখছিলাম। ফরাসী রাজা দ্বিতীয় হেনরী তো মাকে লিখলেন এত সুন্দর, আর মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে আমি আগে দেখিনি। সেই সঙ্গে লিখলেন, তুমি মেরীর তত্ত্বাবধানের জন্যে লেডি ফ্লেমিংকে পাঠিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ করেছ। এমন চমৎকার মহিলা আমি কমই দেখেছি।

ঐ হলো কাল। রাজার নজরে পড়ে গেলেন লেডি ফ্লেমিং। কানাঘুষো চলতে লাগল, তাও হয়তো ব্যাপারটা ঢাকাঢাকির মধ্যে রাখা যেত কিন্তু তা হলো না। লেডি ফ্লেমিং সর্বসমক্ষে জোর গলায়, ফরাসী ভাষায় (স্কটিশ টোনে) বললেন—ফরাসী রাজা দ্বিতীয় হেনরীর দ্বারা আমি মা হতে চলেছি। আমি মনে করি এটা যতটা আনন্দের, ততটাই গর্বের।

এরপর আর লেডি ফ্লেমিং-এর ফরাসী রাজ্যে থাকা হলো না, ফিরে গেলেন স্কটল্যাণ্ডে। আমার ভার পড়ল এক ফরাসী মহিলার ওপর। অবশ্য এরজন্যে আমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু শিশু মনে ঐসব অবৈধ প্রণয়ের ছাপ পড়েছিল, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

যাই হক দিন কাটছিল। মা চেষ্টা করছিলেন আমাকে ইংলেণ্ডশ্বরী করার অর্থাৎ অষ্টম হেনরীর ছেলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে বিয়ে দেবার। এদিকে ফরাসী যুবরাজ ফ্রান্সিসের সঙ্গেও আমার বিয়ের কথা হলো। তখন এতই কম বয়স যে রাজনীতি বড় বুঝতাম না। ফ্রান্সিসকে আমার ভালই লাগত। মা ফ্রান্সে এলেন, দূত স্কটল্যাণ্ডে গেল, কত কথা হলো। শেষ পর্য্যন্ত ১৫৫৮ সালেব ২৪শে এপ্রিল আমাদের বিয়ে হলো। বিখ্যাত নোটরড্যাম চার্চেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

যুবরানী হয়ে কাটালাম। তারপর ফ্রান্সিস রাজা হলো আমি হলাম রানী। কিন্তু কদিনের জন্যে? মাত্র ১৭টি মাস। হ্যা লিখতে ভুলেই গেছি ফ্রান্সের রাজসভায় দেখা হলো বথওয়েলের সঙ্গে। যেন জীবনী শক্তির উৎস। দেখতে ভাল নয়, কিন্তু পুরুষ মানুষ হলে ঐ রকমই তেজী হতে হয়। প্রথমত ফরাসী বাজসভায় স্কটিশ কথা শুনে ভাল লেগেছিল। ওর কাছে ফ্রান্সিসকে যেন কেমন প্রাণহীন মনে হয়েছিল। যাক সে কথা। ও ব্যাপার আর বেশী এগোতে পারেনি। ফরাসী রানী হয়ে কাটাছিলাম কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন, ১৫৬০ সালে ফ্রান্সিস মারা গেল।

ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্টের বিরোধ চলছে দেশে, এ অবস্থায় ক্যাথলিক আমি স্কটল্যাণ্ডে গেলে বিরোধ বাড়বে, কমবে না। কিন্তু ফিরতেই হলো, স্কটল্যাণ্ডে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। তার মধ্যে লর্ড ডার্নলেও ছিল। সম্পর্কে আত্মীয় হতো। আমার কিন্তু ওর সম্বন্ধে কৌতুহল ছিল না। হঠাৎ ডার্নলের হাম জ্বর হলো। সেই সময় আমি ওকে সেবা করলাম, মায়া পড়ে গেল, ভালবাসা নয় কিন্তু। তখন তো বুঝিনি। বিয়ে করে ফেললাম, বছরটা ১৫৬৫।

কিছুদিনের মধ্যেই মনে হলো ডার্নলের কোন যোগ্যতাই নেই আমার স্বামী হবার। আর এই সময় আমার দেখা হলো বথওয়েলের সঙ্গে। নিজেকে আর বাধা দিতে পারলাম না। ভেসে যেতে লাগলাম ভালবাসার স্রোতে। সে বিবাহিত ছিল। কিন্তু সে কথা তার বা আমার কারুরই মনে রইল না। এমন হলো দিন দিন ডার্নলেকে দেখলেই আমার রাগ হতো। আমার মনোভাবকে উত্তেজিত করল বথওয়েল।

এর মধ্যে আমার গর্ভে সন্তান এলো। এই সন্তান সম্ভবতঃ ডার্নলের। ১৯শে জুন ১৫৬৬ তে জন্ম হলো আমার ছেলে, জেমস্ এর। তখন আমি প্রায় বন্দী এডিনবার্গ ক্যাসেলে।

ডার্নলে জন্মসূত্রে ছিল ইংরেজ তাই ইংলণ্ডেশ্বরী প্রথম এলিজাবেথ তাকে তলে তলে মদত দিতেন। ধর্মযুদ্ধ আর কি! চিরাচরিত ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যাণ্টের ব্যাপার। ডার্নলের বিশ্বাসভাজন রিচিওকে হত্যা করা হলো। ডার্নলে সাবধান হতে চাইলেও পারলেন না। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৫৬৭ সালে ডার্নলে যে বাড়িতে ছিল সেটাই বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো।

খুনের দায়ে অনেকের সঙ্গে বথওয়েল এবং আমিও পড়লাম। কিন্তু জানি না কি করে ছাড়া পেয়ে গেলাম। সেই গণ্ডগোলের মধ্য থেকে বথওয়েল আমাকে নিয়ে চলে এলো কারবেরি হিলে। সেখানেই সে তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করে আমাকে বিয়ে করল।

জীবনের আনন্দ উপভোগ কাকে বলে সেটা সবে অনুভব করছিলাম। ঠিক তখনই ১৫ই জুন ১৫৬৭আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো। বথওয়েল পালিয়ে গেল। আমি ধরা দিলাম। সেই থেকে এই বন্দী জীবন চলেছে।

নিস্তব্ধ রাতে আমি পড়ে চলেছি ডাইরি। এই পর্য্যন্ত যখন পড়া হয়েছে তখন দরজায় টুকটুক করে কেউ আওয়াজ করল। কে হবে? স্ত্রীকে বারণ করেছিলাম বিরক্ত না করতে, তবে?

আবার টোকা।

বিরক্ত মুখে দরজা খুললাম। দেখি দামী ভেলভেটের পোষাক পরা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ। মুখটা, পোষাকটা বড় চেনা। তবু কিন্তু মনে করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে রইলাম।

রমনী মোহিনী হাসি হেসে বলল—ভিতরে আসতে পারি।

লজ্জিত হয়ে বললাম—নিশ্চয়, আসুন।

তিনি বসলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—এত রাতে আপনি এখানে এসেছেন কেন? নিশ্চয় জরুরী কাজ আছে—তাছাড়া আমি তো আপনাকে চিনিই না।

—দরকারী কাজ তো বটেই। আমার চিঠিগুলো যে আপনি নিয়ে এসেছেন।

—চিঠি? কোন চিঠি?

—ঐ যে বিখ্যাত ক্যাসকেট লেটার।

—সে তো কুইন মেরী অফ স্কটের প্রেমপত্র বথওয়েলকে লেখা, যার একটা ডার্নলের হত্যার সময় বিচারালয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—ঠিক বলেছেন, সেই চিঠিই। আমি অনেক দিন আগে চিঠির বাক্স থেকে সরিয়ে ফেলে ছিলাম। পাছে ঐসব চিঠি আমার ছেলের হাতে পড়ে। যতই হক প্রেমপত্র তো। তাই তো সেই বিখ্যাত ক্যাসকেট লেটারের কাসকেটটা পেয়েছে, কিন্তু লেটার পায়নি। কাসকেটটা মিউজিয়ামে সাজানো আছে না?

—হ্যাঁ তা আছে। কিন্তু ঐ চিঠিগুলো আমি না পড়ে দেব না।

মহিলা হেসে কিন্তু জোর করে বললেন—চিঠি আমি পড়তে দেব না, আর ডাইরিটাও নিয়ে যাব।—কিন্তু শেষ তো পড়া হয়নি।

—লাভ কি? সবাই তো জানে ১৯ বছর জেলে কাটাবার পর আমার শিরশ্ছেদ হয়েছিল। আর বেচারা বথওয়েল পালিয়েও বাঁচতে পারেনি জেলে পচেছে, যতদিন বেঁচেছিল। এবার ওগুলো দাও।

আমি বাধ্য হয়ে ওগুলো তার হাতে তুলে দিলাম। সে মিষ্টি করে চেয়ে বললে—আমার ডাইরি পড়ে কি করবে তার থেকে হ্যাটফিল্ড হাউসের ইতিহাস পড়। জান তার আত্ম কাহিনী।

—সব কাহিনী জানতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তার থেকে আপনি বলুন না শুনি।

সে যে বিরাট কাহিনী, তাড়াতাড়ি তো বলা যাবে না।

—সংক্ষেপে বলুন। আর একটা প্রশ্ন হ্যাটফিল্ড হাউসে তো আপনার মায়া পড়ার কথা নয়, তবে কেন এর কথা জানতে বলছেন?

—এই প্রাসাদে যে আমার ছেলে আসত তাই একে ভালবাসি। বেচারাকে তো ভালবাসা দিতে পারিনি, সেজন্যে।

বলুন তা হলে—

সুরু করলেন—প্রাসাদটা করিয়েছিলেন সপ্তম হেনরীর মন্ত্রী এলির বিশপ। অষ্টম হেনরী যখন ক্ষমতা পেলেন তিনি তাঁর মেয়েদের আর ছেলেকে এখানে রাখলেন। খামখেয়ালী রাজা হেনরী মেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন না। দেখতে দেখতে তাঁর মৃত্যু হলো।

ইংলণ্ডে অশান্তি সুরু হয়ে গেল। প্রথম এলিজাবেথ শৈশব থেকে রানী হবার আগে পর্য্যন্ত এখানেই থাকতেন। অষ্টম হেনরী মারা যাবার পর

এলিজাবেথের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হলো। এই বাড়িতেই লর্ড এ্যাডমিরাল সাইমোর এলিজাবেথকে বিয়ে করার জন্যে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। আসল অর্থ হলো এলিজাবেথকে বিয়ে করে সিংহাসন দাবী করা। কিন্তু বুদ্ধিমতী এলিজাবেথ বিয়ে তো করলেই না বরং সিংহাসনে বসে সাইমোরের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করলেন।

এলিজাবেথের বড় বোন মেরী যখন সিংহাসনে তখনও এলিজাবেথ এই প্রাসাদেই। মেরী রানী হয়ে একবার এখানে এসেছিলেন তখন এলিজাবেথ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে মেরীকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। নানা অনুষ্ঠান হয়েছিল। অবশ্য মেরী এত খরচ সুনজরে দেখেননি। তারপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি হ্যাটফিল্ড। ১৫৫৮ সালে মেরী মারা গেলেন। এলিজাবেথ জানতেন না খবরটি। তিনি অন্য দিনের মত তাঁর প্রিয় ওক গাছের নিচে বসে বই পড়ছিলেন তখন তাঁর কাছে মেরীর মৃত্যু সংবাদ এবং তাঁর সিংহাসনে বসার খবর দেওয়া হলো। তিনি আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে বলে উঠেছিলেন—It is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes.

তাঁর প্রথম মন্ত্রী সভা বসেছিল হ্যাটফিল্ডেরই হল ঘরে। এরপর তিনি হয়তো বেশী দিন এখানে থাকতে পারেননি কিন্তু তাঁর উপস্থিতি আজও অনুভব করা যায়। মহিলা দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বলেন—এবার চলি।

—আপনার ছেলের কথা কিছু বলবেন না?

—কি হবে তার কথা জেনে?

—এই বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাই জানতে চাই, আর কিছু না।

—আমার ছেলে যা করেছে তার থেকে বেশী করেছে উইলিয়াম সেসিল, রানীর মন্ত্রী। এখন যে বাড়ি দেখছ তার অধিকাংশই তাঁর করা।

—তারপর?

কোন উত্তর না দিয়ে মহিলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দৌড়ে বেরলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না কাউকে। আমি অবাক হলাম, বিস্মিত হলাম, কিন্তু ভয় পেলাম না। মনে হলো, আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলাম, দৌড়ে গেলাম, আমার টেবিলের কাছে, না, নেই, সেই ডাইরি বা চিঠির তাড়া কিছুই নেই।

ঐ দিন থেকে নেশা হয়ে গেল হ্যাটফিল্ডের কথা শোনার। কত রাত থেকেছি প্রাসাদে, আনাচে কানাচে ঘুরেছি। ইতিহাস জানার জন্যে নয়, সে

তো বইতেই আছে, আরও কিছু জানার ইচ্ছা। কিং জেমস ড্রইংরুমে বিশাল মাপের জেমসের মূর্তি রয়েছে ফায়ার প্লেসের ওপর, লাইব্রেরীতে রয়েছে ছবি, কিন্তু কোন দিন কিছু দেখিনি বা শুনিনি।

জানুয়ারী মাসের এক শীতের রাতে এত তুষার পড়ছিল যে বাড়ি ফিরতে আর ইচ্ছা করল না। থেকে গেলাম হ্যাটফিল্ড হাউসে। ফায়াব প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে ঘব গবম করে শুয়েছিলাম। তখন হ্যাটফিল্ডেব কর্তা ছিলেন জেমস (চতুর্থ মাবকুইস)। সে সময় তাঁবা লণ্ডনেব বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাই বিশেষ লোক ছিল না। যাই হোক ঘরটা গরম হতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল—আগুন, আগুন, ধড়মড় করে উঠে ফায়াব প্লেসের দিকে দেখলাম, যেমন আগুন জ্বলছিল তেমনিই জ্বলছে। তবে? তবে কি অন্যত্র? আমার আগেই চিন্তা হলো লাইব্রেরী জন্যে, ছুটলাম সেদিকে। মনে হলো আমাব পিছনে কেউ ছুটে আসছে, ফিরে দেখলাম এক বৃদ্ধা জ্বলন্ত অবস্থায় ছুটে আসছে। আমাকে ফিরতে দেখে বলল—বাঁচাও, বাঁচাও, বড় কষ্ট।

মহিলাকে কোনদিন ঐ প্রাসাদে দেখেছি বলে মনে হলো না। তার জন্য অবশ্য কিছু নয়। আমি বললাম—আপনি ছুটবেন না। তাতে আগুন আরও বাড়বে, মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিন।

তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—অনেক চেষ্টা কবেছি কিন্তু আগুনের হাত থেকে বাঁচতে পারিনি।

—বিপদ কি করে হলো? ফায়ার প্লেস থেকে আগুন লেগেছে?

—না, না, ইলেকট্রিকের আলগা তার থেকে এই বিপত্তি। তুমি আমাকে বাঁচাও।

হঠাৎ মনে পড়ল আমার বিছানায় কম্বল আছে, তাড়াতাড়ি সেটা আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। এদিক ওদিক খুঁজলাম। একজন রক্ষির সঙ্গে দেখা হতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা এইমাত্র একজন বৃদ্ধা আগুন লাগা অবস্থায় ছুটে এলেন, তিনি কোনদিকে গেলেন, দেখেছ?

রক্ষিটি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি কি এর আগে এখানে রাতে থাকেননি?

—থেকেছি তো, কেন?

—তবে ওনাকে দেখেননি কেন বুঝতে পারছি না।

—কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।

—উনি, লেডি এমিলি মেরী ছিল।

—অর্থাৎ প্রথম মারকুইসের স্ত্রী! সে তো আজ থেকে প্রায় 'একশ' বছর আগের ঘটনা।

—হ'লে কি হবে, ওনার এই বাড়ির প্রতি ভীষণ মায়া ছিল। শুনেছি তিনি ঘোড়ায় চড়ে তার জমিদারিতে ঘুরে বেড়াতেন আর গরীবদের অর্থ সাহায্য করতেন। ভেলভেটের ব্যাগে করে গিনি, মোহর নিয়ে যেতেন। তখনকার দিনের টোরিদলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লণ্ডনে যেখানে জুয়া খেলা হতো, তাঁকে সেখানেও দেখা যেত, সারা রাত জুয়া খেলতে। আশী বছর বয়স পর্য্যন্ত শিকার করেছেন, ঘোড়ায় চড়েছেন, কিন্তু মৃত্যুটা বড় করুণ—আগুনে পুড়ে অমন একটা প্রাণবন্ত জীবন শেষ হলো।

এ কাহিনী শুনে শীতের রাতেও আমি ঘেমে উঠলাম।

প্রাসাদের আত্মকাহিনী এখানেই শেষ, কারণ আর পাতা নেই। ভাবলাম এবার বাকীটা নিজের চোখেই দেখব।

বাস এসে থামল হ্যাটফিল্ড হাউসে। বই পড়ে এমনই হয়েছে যে প্রাসাদ দেখে মনে হলো যেন আগে এসেছি।

ভেতরে গেলাম। সিঁড়ির ধারের কাজ বিশেষ করে কাঠের কাজ আর পাথরের মূর্তি সত্যই আকর্ষণীয়। ছবি দেখলাম লেডি এমিলি ছিলের। সুন্দরী ছিলেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই, সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিতাও বটে।

কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ঘুরলাম, এলাম লাইব্রেরীতে। সাজান বইএর তাক দেখে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এখানেই ছিল মেরী কুইন অফ স্কটের চিঠি। কি ছিল সে প্রেম পত্রে? কোথায়ই বা গেল সেগুলো? রহস্য বটে। চ্যাপেল, রান্নাঘর, অস্ত্রাগার সবই দেখলাম। ঘুরে বেড়ালাম বাগানে।

ঘুরতে ঘুরতেই বিকেল হয়ে গেল. প্রাসাদের ওপর লাগান ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি ৪টা বেজে গেছে। ভাবলাম আর দেরী নয়।

ফিরে চললাম লণ্ডনের দিকে। হঠাৎ মনে হলো লেডি ব্রিয়েনের একটা ছবিও তো দেখলাম না। অথচ হ্যাটফিল্ড হাউসে তার অবদানও কিছু কম নয়। মেরীকে, এলিজাবেথকে এবং এডওয়ার্ডকে দেখা শোনা সেই করেছে। এমনকি যখন রাজকুমারীদের ভালভাবে খাবার ব্যবস্থাও খেয়ালী রাজা করেননি তখন সেই নানা ভাবে তাঁদের যত্ন করেছেন।

মিসেস ডেলটন বলেন—অনেকে নাকি দেখেছে শাদা পোষাক পরা প্রৌঢ়া

মহিলা এদিক ওদিক তাকিয়ে, সাবধানে কি যেন ঢেকে নিয়ে এলিজাবেথের শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছেন। হয়তো, কল্পনা। তবু এর মধ্যে স্নেহের বা বা মাতৃত্বের একটি মধুর স্পর্শ পাওয়া যায়। মাতৃহারা তিনটি শিশুকে সে তো মায়ের আদরেই বড় করেছিল, তাও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে।

দেখতে দেখতে লণ্ডনে পৌঁছে গেলাম। এরপর কোন প্রাসাদে যাব এখনও ঠিক করিনি।

টেমস কটেজ

কিছুদিনের বিশ্রাম চায় চার্লস। আর না চাইবেই বা কেন? নাগাড়ে কাজ করতে আর কার ভাল লাগে। প্রথম প্রথম কারখানা গড়ার নেশায় কেটে গেছে, এখন একটু ছুটি চাই।

লণ্ডনের বুকের উপরই থাকে। দিনগুলো যেন কলের চাকা, একভাবে ঘুরে চলেছে। শুধু ঘোরা নয়, দ্রুত গতিতে ঘুরছে। ছায়া নিবিড় শান্তির নীড় দরকার তার। ভেবে ভেবে ঠিক করল হ্যামটন কোর্টের কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকবে। তাহলে ব্যবসার ব্যাপারে প্রয়োজন হলে চলে আসতেও পারবে।

ছোট্ট গাড়িখানা নিয়ে একদিন সকালে চার্লস বেরিয়ে পড়ল।

রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে যেখানে টেমস নদী বাঁক নিয়েছে তার কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠল চার্লস।

যে বেয়ারাটা বারে বারে ওর ঘরে আসতো তাকে চার্লসের খুব পছন্দ ছিল। ওকে আদর করে ববি বলে ডাকত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কি কাজে যেন ববি চার্লসের ঘরে এলে সে বলল—ববি, তোমাদের এই হোটেলে আমার তেমন ভাল লাগছে না।

ববি দুঃখিত স্বরে বলল—কেন স্যার, যত্নের কি কোন ত্রুটি হচ্ছে?

মোটেই না বরং বেশীই হচ্ছে।

তবে?

ববি, আমি যত্ন পাবার জন্যে আসিনি। একটু নির্জনতার জন্যে লণ্ডন ছেড়েছিলাম।

এবার ববি একটু কৌতুকের হাসি হেসে বলে, হোটেলে কখনও নির্জনতা পাওয়া যায়? এখানে তো নিত্য গোলমাল লেগেই থাকে।

ঠিকই বলেছ, বড় ভুল হয়ে গেছে, দেখি কোথাও ছোট বাংলো বাড়ি পাই কি না।

নির্জন বাড়ি চান? আছে একটা।

তোমার সন্ধানে বাড়ি আছে? আরে বল বল।

হঠাৎ ববি কেমন চুপ করে যায়। চার্লস উৎসাহ দেবার মত করে বলে—কি হলো চুপ করে গেলে কেন? বল না কি বাড়রি কথা বলছিলে।

বাড়িটা কিন্তু ভাড়ার জন্যে নয়, বিক্রির জন্যে আছে। কিনবেন?

সে তো খুব ভাল কথা। কোথায়? পছন্দ হলে কিনবো।

—পছন্দ তো হবেই। চমৎকার বাড়ি, নেহাৎ দেখার অভাবে পোড়ো হয়ে আছে।

বাড়িটা কোথায় বা কার তা তো বলবে।

মিসেস হাওয়ার্ড বলে একজন বৃদ্ধা আছেন, এটা তাঁর বাড়ি। হ্যামটন কোর্ট প্রাসাদের পিছন দিকে, টেমস নদীর ধারে। বড় সুন্দর, বড় চমৎকার জায়গা।

আজ সন্ধ্যায় গিয়ে বাড়িটা দেখে আসব।

ববি খুশি হয়ে উঠে বলে—চলুন না, এখনই যাওয়া যাক।

এখন নয়, বিকেলে। আচ্ছা ভদ্রমহিলা বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছেন কেন?

বুড়ি এটা রেখেই বা কি করবে, কেই বা আছে ওর।

ঠিক পাঁচটায় ওরা বেরোল। হোটেল থেকে বাড়িটার দূরত্ব বেশী নয়। মিনিট দশেক গাড়ি চালাতেই পৌঁছে গেল।

সত্যিই চমৎকার বাড়ি। লাল পাথর দিয়ে গাঁথা দেওয়াল, বড় বড় সাদা জানালা। মাথায় টালির ছাদ। অবশ্য বাগান এখন আগাছায় ভর্তি।

ববি, বাইরে থেকে বাড়ি তো পছন্দ হয়েছে, তবে ভিতরটা একবার দেখতে পারলে হতো।

বেশ তো চলুন না একবার মিসেস হাওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করে আসি আর ওনার কাছ থেকেই চাবি এনে বাড়িটা খুলে দেখে নিলে হয়।

মিসেস হাওয়ার্ডকে যে খবর দেওয়া নেই।

একগাল হেসে ববি বলল—আমি খবর দিয়ে রেখেছি।

তবে তো খুব ভাল। চল যাই।

ওরা আবার গাড়ীতে উঠল। একটু দূর গিয়ে, ছোট ব্রীজ পেরিয়ে একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এলো। ববি নেমে আগে আগে গেল। চার্লস আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কয়েকটা ধাপ উঠে সদর দরজা। ববি বেল বাজাল। অপেক্ষা করল। কেউ এলো না।

অপেক্ষা করতে করতেও মিনিট দশেক চলে গেল। চার্লসের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গে এমন সময় দরজা খুলল। এক অশীতিপর বৃদ্ধার মুখ দেখা গেল, কে?

আমি, আমরা।

আমরা কে বাবা, এই ভর সন্ধ্যায়।

ববি যেন একটু দমে যায়, তবু আশা না ছেড়ে বলে—আজ সকালে ফোন করেছিলাম না যে লণ্ডন থেকে মিঃ চার্লস এসেছেন, তিনি আপনার বাড়ি··· ববির কথা শেষ করতে না দিয়ে বৃদ্ধা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, এসো এসো।

এতক্ষণে চার্লস সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধাকে অনুসরণ করে।

মিসেস হাওয়ার্ড নিজের মনে গজ-গজ করে চলে—বুড়ো বয়সের এই দোষ, কোন কথা মনে রাখতে পারি না।

ঘরে ঢুকলো ওরা। পুরানো দিনের আসবাবপত্র দিয়ে বসার ঘর সাজান। চেয়ারের কাপড়গুলো বেশ ময়লা হয়ে গেছে। ঘরের দেওয়ালে টিউডর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত রাজা-রাণীর ছবি টাঙ্গান রয়েছে।

চার্লস বলে—আমি টেমস নদীর ধারে আপনার বাড়িটা কেনার জন্যে এসেছি।

তবে বাড়িটা আমরা বাইরে থেকে দেখেছি, একবার ভিতর থেকে দেখতে চাই।

ঠিক আছে, তবে কালকে এসো।

কালকে কেন? আজই চাবিটা দিন, আমরা দেখে এসে চাবি ফেরৎ দেবো। আর যদি আমাদের সঙ্গে কেউ যেতে চান যেতে পারেন।

কে আর যাবে বাবা, আমি তো একা।

কারুর যাবার দরকার নেই আমরাই যাব।

না, না, তা হয় না, তোমাদের এই রাত-বিরেতে একা ছাড়তে পারব না।

চার্লস বৃদ্ধার কথা শুনে হেসে ফেলে বলে—আন্টি, আমরা কি ছেলে মানুষ যে ভয় পাব, চাবিটা দিন না।

বৃদ্ধা এবার বেশ দৃঢ় স্বরে বলেন—না, দেবো না এখন। আগে তোমাকে ঐ বাড়ির ইতিহাস শুনতে হবে, তারপর একটা দিন মনে মনে ভাববে ঐ বাড়ি নেবে কিনা। তারপর বাড়ির চাবি দেবো।

ওরা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই কথা বলছিল হঠাৎ বৃদ্ধার খেয়াল হলো, বললেন—আরে, তোমরা তো দাঁড়িয়েই রইলে, বসো। আমি তোমাদের জন্যে একটু পানীয় নিয়ে আসি।

চার্লস সোরগোল তুলে বলে—না. না, আন্টি, পানীয়ের দরকার নেই, আপনি বলুন কি বলতে চান, আমরা শুনি।

সে কি কথা, তোমরা আমার অতিথি, অন্ততঃ একটু ওয়াইন যদি না দিই তবে ভীষণই লজ্জার ব্যাপার হবে।

ওদের কথা বলার সুযোগটুকু না দিয়ে তিনি কক্ষান্তরে চলে গেলেন। একটু পরে গ্লাস, ওয়াইনের বোতল আর জল নিয়ে ফিরে এলেন।

গ্লাসে পানীয় দিয়ে, নিজে একটি গ্লাস নিয়ে ওদের বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে বসলেন।

কয়েক মিনিট নীরব থেকে তিনি সুরু করলেন—দ্যাখো মিঃ চার্লস, তুমি বাড়ি কিনবে যখন, তখন সব কথা তোমার জানা দরকার। ঐ যে বাড়িটা তুমি কিনতে চাও ওটা আমার শ্বশুরের বড় ভাই মিঃ উইলিয়াম হাওয়ার্ডের। ইনি বিয়ে-থা করেননি কাজেই সম্পত্তি আমার স্বামীর হয়।

মিঃ হাওয়ার্ড ভাল লোক ছিলেন, পঞ্চম জর্জের সভায় ভাল প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। রাজানুকুল্য পেলে যা হয়—ওনারও তাই হয়েছিল, প্রচুর টাকা-কড়ি করেছিলেন। নিজে বিয়ে-থা করেননি তবে একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন, তার নাম ছিল পেট্রিশিয়া। মেয়েটি ইংরেজ নয়, হয় জার্মান নয় রাশিয়ান।

চার্লস মাঝখানে কথা বলে ওঠে—সেইজন্যেই কি বিয়ে হয়নি ?

না, না, এর জন্যে বিয়ে না হবার কিছু ছিল না। কারণ অন্যখানে। আগেই বলেছি, মিঃ উইলিয়ামের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ছিল। এই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল জন প্রে নামে। সে জানতো পেট্রিশিয়াকে মিঃ উইলিয়াম ভালবাসেন। তৎসত্ত্বেও সে পেট্রিশিয়ার দিকে এগোতে থাকে। উইলিয়াম যখন সেটা জানতে পারেন তখন তিনি তাকে লণ্ডন থেকে এনে টেমস কটেজে তোলেন। বেশ কদিন আনন্দে কাটে। একদিন রাত্রে পেট্রিশিয়া পিয়ানো বাজাচ্ছিল আর বাজনা শুনতে শুনতে ওঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ একটা

চিৎকারে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে যায়, চেয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পেট্রিশিয়া পিয়ানোর কাছে পড়ে আছে আর চারিধার রক্তে ভাসছে।

কে হত্যা করল ধরা গেল না। মাঝখান থেকে উইলিয়ামকে কতকটা পুলিশ-ঘর করতে হলো। অবশ্য তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তিনি ছাড়া পেয়ে গেলেন, কিন্তু বেশীদিন বাঁচলেন না। ওদিকে মিঃ জন গ্রে-কে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। এর কিছুদিন আগেই এ বাড়ি দেখাশোনা করত যে মেয়েটা তাকে একটা ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে দেখা গেল।

চার্লস এতক্ষণ একভাবে মৃত্যুর গল্প শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বলল—দেখুন মিসেস হাওয়ার্ড, এ সব গল্প শুনে আমি কি করব। বাড়ী পছন্দ হলে কিনে নেবো, ব্যাস, আর কোন কথা নেই। চাবিটা দিন, যাই দেখি।

বৃদ্ধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঠেন, বলেন—তুমি যখন শুনবে না, আজই দেখবে বলছ তখন এনে দিচ্ছি। যাক তুদিন, তারপর বাড়ী কিনবে কিনা মনস্থির করে নিও।

চাবি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল টেমস কটেজের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যা হলেও রাত্রের গাঢ় কালিমা সব কিছু ঢেকে ফেলেনি।

ফটক ঠেলে বাগানের পথ বেয়ে ওরা সদর দরজার কাছে এলো। বিশাল ছখানা চাবি দিয়েছিলেন মিসেস হাওয়ার্ড। কোন চাবিটা যে কোন তালার তা জানা ছিল না, তা ছাড়া বহুদিন অব্যবহারে মরচে ধরে যাওয়ায় তালা খুলতে দেরী হলো।

দরজা খুলে প্রথমেই বসার ঘর। কার্পেট পাতা। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। তবু টর্চের আলোয় আর অন্ধকারে ঠাওর করে করে ওরা ঘরের চারপাশ ঘুরে দেখল।

ঘরের মাঝ বরাবর একটা দরজা, চার্লস সেটা খুলল, আর একটা ঘর। পালঙ্ক পাতা। মাঝামাঝি একটা সোফা সেট, অন্য দিকে পিয়ানো।

এই সেই পিয়ানো নাকি? যেখানে বসে পেট্রিশিয়া বাজাতো। চার্লসের গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে। সে মোটেই ভীতু প্রকৃতির নয় তাই ক্ষণিকের ভয়-ভয় ভাবকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে। ভালই লাগে।

মনস্থির করে ফেলে বাড়িটা কিনবে। মিসেস হাওয়ার্ডকে জানিয়ে দেয় সে কথা। ঠিক হয় পরের সপ্তাহে রেজিষ্ট্রি হবে।

যখন ওরা হোটেলে ফেরার জন্যে উঠল তখন বৃদ্ধা বলল—আমি বলি কি, কেনার আগে তুমি দুদিন থেকে খ্যাখো।

না, না, তার দরকার হবে না ; আমি কিনেই থাকব।

মিসেস হাওয়ার্ড এবার চটে ওঠেন,—বারে বারে তর্ক কর কেন, যা বলছি শোন। বাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে কাল থেকে থাক। এই নাও চাবি।

চার্লস আর বৃদ্ধাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না।

হোটেলে ফিরে চার্লস ভাবতে লাগল কাল একজন লোক নিয়ে গিয়ে বাড়িটা পরিষ্কার করাবে। সন্ধ্যায় টেমস নদীর দিকের বারান্দাটায় বসে থাকলেই সময় কেটে যাবে।

রাতের আহার সেরে চার্লস বেশ তাড়াতাড়ি হোটেলের বিছানায় গেল। ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগল উইলিয়াম হাওয়ার্ডের কথা। দুর্ভাগা ভদ্রলোক, যাকে ভালবাসলেন তাকে পেলেন না। আর মেয়েটাও তো অকালে জীবন দিল···আহা মেয়েটা তো জানতো উইলিয়াম তাকে ভালবাসে তবে আবার জন প্রে-কে এগোতেই বা দিল কেন ?

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে চার্লস, হঠাৎ একসময় আপনা আপনি ঘুমটা ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে চার্লস জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ জলজল করছে। আবহাওয়াটা এখন বড়ই সুন্দর। দূরে টেমস নদীতে চাঁদের আলো পড়ে কেমন মোহময় লাগছে।

চার্লসের হঠাৎ মনে হলো এই রাতে টেমস কটেজে গেলে বেশ হয়। চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরী হয়ে পড়ে।

টর্চ আর চাবি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে চার্লস পৌঁছোয় টেমস কটেজে। নেমে বাড়ির বাগানে ঢোকে। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তারপর নদীর দিকের বারান্দায় যায়। সেখানে দুটো পাথরের বেঞ্চি রয়েছে। ইচ্ছা হ'লো বসতে, পরক্ষণেই মনে হলো নিশ্চয় ধুলো আছে। আঙুল দিয়ে একবার পরীক্ষা করল, কই ধুলো তো নেই। আবার পরীক্ষা করল, এবার সম্পূর্ণ হাতের পাতা দিয়ে, নাঃ ধুলো নেই। কে জানে কে পরিষ্কার করেছে। চার্লস নিশ্চিন্তে বসে। টেমস নদীটা প্রায় কটেজের ধার ঘেঁষেই গেছে। ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকে সে। মনটা যেন ভরে ওঠে।

হঠাৎ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নদীর ধারের সাদা মত একটি ছায়া। ওটা কি ?

তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই বুঝতে পারে সেটি আর কিছু নয় একটি নারী-মূর্তি।

কি করছে মাঝরাতে? আত্মহত্যা করতে গেছে নাকি?

সে দ্রুত পা ফেলে ঘাস পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে যায়। মেয়েটির কাছে পৌঁছোতে দেরী হয় না, দেখে বিয়ের সাদা পোষাকে একটি নারী জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কেউ নেই।

ঘাস পাতার শব্দ তুলে চার্লস যে এলো, মেয়েটির কিন্তু সেজন্য কোন চাঞ্চল্য হলো না, এমন কি তার উপস্থিতিও যে সে বুঝতে পেরেছে তাও মনে হলো না। নিশ্চল মূর্তি হয়ে জলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে খুব ইচ্ছা হয় চার্লসের। সে বেশী করে ঝরা পাতায় জুতোর শব্দ তোলে। কিন্তু বৃথা।

সে পাষাণ মূর্তি।

এবার সোজাসুজি চার্লস ডাকে—শুনছেন, আপনি কে?

মুখ না ফিরিয়েই মেয়েটি এবার সাড়া দেয়—আমি কে, সে কথা জেনে আপনার লাভ?

লাভ লোকসানের কথা জানি না, এত রাত্রে এভাবে আপনি একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাই···

আপনিও তো একা এত রাত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাতে?

আমি তো পুরুষ।

ওঃ, মেয়েদের বুঝি এরকম দাঁড়াতে নেই? তরল কণ্ঠের উত্তর।

না, তা কেন?

যাক, আপনাকে তো নতুন দেখছি।

হ্যাঁ আমি নতুনই। 'টেমস কটেজ' বাড়িটা কিনব বলে এসেছি।

তাই দেখছিলাম সন্ধ্যাবেলায় টেমস কটেজটা ঝাড়পোঁচ হচ্ছে। বাড়িটা বড় সুন্দর।

আপনি দেখেছেন?

দেখেছি তো।

হঠাৎ চার্লসের খেয়াল হয় মেয়েটি একবারও সামনে ফেরেনি। বলে—আরে, আপনি এত কথা বলছেন আর এদিকে ফিরছেন না কেন?

ফিরলে আপনি খুশী হবেন?

খুশী হব কিনা জানি না, তবে স্বস্তি পাব।

ঠিক আছে, ফিরছি।

চার্লস স্তম্ভিত হয়ে যায়, এত রূপ! মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় 'অপূর্ব!'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে, যেন পিয়ানোর রিডের উপর কে দ্রুত হাত চালিয়ে যায়।

আবিষ্ট চার্লস শুনতে পায়—কি, মুগ্ধ হয়ে গেলেন নাকি?

সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

আবার সেই হাসি। আমি জানি। মুগ্ধ না হলেই অবাক হতাম।

তাহলে আপনি খুব গর্বিতা বলুন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার একটা শব্দ হয়, তারপর ধীরে ধীরে সে বলে—সত্যিই এক সময় আমার খুবই গর্ব ছিল, কিন্তু এখন মনে হয় রূপই আমার জীবনের অভিশাপ।

অভিশাপ! কেন?

সে অনেক কথা। কি হবে শুনে?

আপনার ইচ্ছা যদি না থাকে তো থাক।

ইচ্চা আছে, কিন্তু লাভ নেই।

বলে দেখুন না কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।

দান চালা হয়ে গেছে, আর উপায় নেই। তবে আপনাকে হয়তো একদিন সব কথা বলব।

আর একটা প্রশ্ন—আপনি নব-বধূর বেশে একা এমন করে কার অপেক্ষা করছেন?

যার জন্যে অপেক্ষা করা উচিৎ অর্থাৎ আমার ভাবী স্বামীর।

তিনি বিয়ের কাজ না সেরেই কোথায় গেলেন?

তা তো জানি না, তবে তিনি ইচ্ছা করে যাননি, যেতে বাধ্য হয়েছেন।

চার্লস ভেবে পায় না কি বলা উচিত।

মেয়েটি আবার সেই জলতরঙ্গের হাসি হেসে উঠে বলে—কি, মন খারাপ হয়ে গেল?

সত্যি মন খারাপ হয়ে গেছে।

চলুন এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, যে বাড়ীটা কিনছেন সেখানেই যাওয়া যাক।

একা একা যেতে চার্লসের কেমন লাগছিল; এখন একজন সঙ্গী পেয়ে ওর উৎসাহ হলো, বলল—চলুন না।

চাবি বার করে দরজা খুলল। চার্লস টর্চ বার করে জ্বালাতেই মেয়েটি প্রায় চিৎকার করে উঠল—না, না, আলো নয়।

কিন্তু বড় যে অন্ধকার।

ভয় করছে?

না, না, ভয় করবে কেন?

সত্যি? একবারও মনে হচ্ছে না প্রেট্রিশিয়ার কথা বা সেই যে-মেয়েটা ওদের কাছে কাজ করত?

মনে হবে না কেন, মনে হচ্ছে তবে ভয় হবে কেন বলুন, আমার সঙ্গে তো তাদের শত্রুতা নেই। আমার ক্ষতি কেন করবে তারা?

ঠিকই বলেছেন, আসুন, জানালাগুলো খুলে দিই, তা হলেই আলো আসবে।

মেয়েটি জানালা খুলে দিল, ঘরের মধ্যে মৃদু চাঁদের আলো এসে পড়ল। ঘরে অন্ধকারের গভীরতা কমে যেতে লাগল।

তরল ভাবে মেয়েটি বলল—কি, এবার ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, বেশ লাগছে। গল্প বলবেন বলেছিলেন, কি হলো?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটি বলল—আমার গল্প আর কি শুনবেন, তার থেকে পিয়ানো বাজাই শুনুন।

পিয়ানো পরে হবে, আগে গল্প।

আমার কথা পরে বলছি। আপনি পেট্রিশিয়ার সম্বন্ধে কি জানেন?

মিসেস হাওয়ার্ড বলছিলেন যে—

মেয়েটি বেশ উত্তেজিতভাবে বলে মিসেস হাওয়ার্ড কিছুই জানেন না। উনি বলতে চান পেট্রিশিয়াকে মেরেছে জন প্রে। কিন্তু বেচারা নির্দোষ—

দেখুন, আমি পেট্রিশিয়া বা জন প্রে কারুর সম্বন্ধেই কৌতূহলী নই। আমার জানার দরকারই বা কি বলুন না?

না জানারই বা কি আছে?

যাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তাছাড়া যারা এ পৃথিবীতে নেই তাদের খবর জানার আমার কোন আগ্রহও নেই।

পৃথিবীতে তারা নেই সেজন্যে তাদের কথা জানবেন না? এ কি একটা যুক্তি? তবে ইতিহাস পড়েন কেন?

দেখুন সে সব রাজা মহারাজার কীর্তি, তাই জানা দরকার।

তাহলে পারিষদদের কুকীর্তিই বা জানবেন না কেন? শুনুন আমি বলছি।

যখন আপনি জোর করছেন তখন বলুন।

অনুগ্রহ করে মন দিয়ে শুনুন।

বলুন শুনছি।

মেয়েটির কয়েক মুহূর্ত বিরাম নেয় তারপর বলে—পেশিয়া পেট্রিশিয়া ছিল রাশিয়ান মেয়ে। তার বাবা কি কাজে যেন লণ্ডনে আসেন। পরে এখানেই থেকে যান। পেট্রিশিয়ার জন্ম এখানেই। পড়াশোনা করার সময়েই তার সঙ্গে উইলিয়ামের আলাপ হয়। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব এবং পর্যায়ক্রমে জীবনসাথী হবার প্রতিজ্ঞায় পৌঁছাল। উইলিয়াম আর পেট্রিশিয়ার এই ব্যাপার জানত উইলিয়ামের প্রিয় বন্ধু জন প্রে আর জানত ডেভিড ক্রো।

ডেভিড ক্রো দেখতে যেমন বিদ্‌ঘুটে স্বভাবেও তেমনি কুচক্রী। উইলিয়ামের অনেক সম্পত্তি আছে তা সে জানত। সে ঠিক করেছিল পেট্রিশিয়া উইলিয়ামকে বিয়ে করে নিলে সে তাকে মেরে পেট্রিশিয়াকে বিয়ে করবে। তা হলে সব সম্পত্তি আসবে তার হাতে।

পেট্রিশিয়া এটা বুঝতে পেরে জন প্রেকে বলে। জন প্রের অবস্থা সাধারণ ছিল। সে কখনও বড় হবার স্বপ্নও দেখতো না। বন্ধুকে ভালবাসতো প্রাণ থেকে। সে সব শুনে বলেছিল—পেট্রিশিয়া, এ কথা এখন উইলিয়ামকে বলো না, ও আবার রাগী মানুষ।

—কিন্তু কদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে, কিছু তো করতে হবে।

—তুমি কিছুদিন আমার সঙ্গে ঘোরো, তাহলে ডেভিড ভাববে তুমি আমাকে বিয়ে করবে। তখন উইলিয়ামের অনিষ্ট করার কথা ভুলে যাবে।

বেচারা পেট্রিশিয়া তাই করল। কিন্তু উইলিয়াম গেল চটে। জন অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু মিঃ হাওয়ার্ড বুঝল তো না-ই বরং বলল হাওয়ার্ড বংশে আবার অষ্টম হেনরীর স্ত্রী ক্যাথারিনের মত আর এক অবিশ্বাসী বৌ আসার ব্যবস্থা হচ্ছে।

—তার ভুল ভাঙাবার জন্যে পেট্রিশিয়া চলে এলো এই টেমস কটেজে। কদিন বেশ আনন্দে কাটাল। বিয়ের দিনও ঠিক হলো, কিন্তু বিয়ে করা আর হলো না।

চার্লস বলল—মাপ করবেন আপনার কথার মধ্যে বাধা দেওয়ায়।

না, না, কি বলছেন বলুন না।

একটা প্রশ্ন জাগছে, ডেভিড তো চেয়েছিল ওদের বিয়ে হোক তারপর উইলিয়াকে মারবে। কিন্তু এখানে তো উল্টো হ'য়ে গেল।

—সেই কথাতেই আসছিলাম। উইলিয়াম তার প্রেমিককে নিয়ে চ'লে আসাতে মিঃ ক্রো খুবই খুশী হয়ে উঠল। তার ঐ হিংস্র মনোভাব দেখে জন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না, সে রাজাকে সব কথা বলে দিল। রাজার সঙ্গে তারও বন্ধুত্ব ছিল। রাজা তখনই ক্রোকে বন্দী করে টাওয়ার অব লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

ফলে ডেভিড প্রতিশোধ নেবার জন্যে লোক নিয়োগ করলে। নিজে রইল কারাগারে, সন্দেহের বাইরে। ওর লোক এসে হত্যা করল পেট্রিশিয়াকে, জন প্রেকে আর এই বাড়ির পরিচারিকাকে।

এবার দুটো প্রশ্ন করছি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

উইলিয়ামকে খুন করল না কেন? আর পরিচারিকাকে তো মারেনি, সে আত্মহত্যা করেছে, আর যদি মেরেও থাকে, কেন?

—এতো সোজা, পরিচারিকা এসে পড়েছিল তাই খুনী পালিয়ে গিয়েছিল, উইলিয়ামকে মারতে পারেনি। পরে পরিচারিকাকে মারল এই জন্যে যে সে খুনীকে সনাক্ত করতে পারে।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

মেয়েটিই প্রশ্ন করে—কেমন শুনলেন?

বড়ই করুণ।

মেয়েটি হেসে বলে—আপনি এতক্ষণ লক্ষ্মী ছেলের মত গল্প শুনলেন তাই আপনাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাব।

উত্তম প্রস্তাব।

মেয়েটি তন্ময় হ'য়ে বাজায়। চার্লসও শোনে মন দিয়ে। এক সময় তা শেষ হয়।

মেয়েটি প্রশ্ন করে—কেমন?

অপূর্ব! বহুদিন বাদে এই সুর শুনলাম। আমার ঠাকুরমা এই ধরনের সুর বাজাতেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আচ্ছা এত কথা বললেন কিন্তু আপনার নাম তো বললেন না।

মেয়েটি যেমন পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল তেমনই রইল, শুধু তার মাথাটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে চার্লসের দিকে ফিরে বলল—এখনও বোঝোনি? আমিই তো পেট্রিশিয়া।

চার্লসের আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল সে হাসপাতালের বিছানায়।
